

ঘটনার ঘনঘটা

নীললোহিত



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

চলন্ত বাসের দোতলা থেকে কে যেন ডাকলো, নীশু ! নীশু !

আমি চমকে উঠে প্রথমে বুঝতেই পারিনি ডাকটা কোথা থেকে এলো । অন্তরীক্ষ থেকে ? রাস্তার এদিকে-ওদিকে কোনো মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে নেই । এ পাড়ায় আমাকে কারুর চেনবারও কথা নয় । তবে কে ডাকলো ? দোতলা বাসটা একটু আগেই স্টাট নিয়ে বেরিয়ে গেছে, ঐ বাসের জানলায় কারুকে দেখতে পাইনি ।

তাহলে কি একটা ডাক শুধু শুধু হাওয়ায় ভেসে চলে যাবে, আমার কোনো উত্তর দেওয়া হবে না ?

বর্ষার আকাশ মাথায় নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম শেক্সপীয়ার সরণির মোড়ে । একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে । এখন আকাশ কালো, এই কালো আকাশ অনেকখানি বিকেল খেয়ে ফেলেছে আজ । সামনের ময়দানের গাছগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ফিনফিনে বাতাস । বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের ঘড়িটা বন্ধ । ভেতরে মহাশূন্যের গ্রহ-নক্ষত্রের খেলা দেখাচ্ছে, বাইরে সময়ের ঠিক নেই ।

একটা সিগারেট ধরালুম । দুম করে বৃষ্টি না এসে গেলে এই সব ব্যস্ত রাস্তায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে নানারকম মানুষের চলচ্চিত্র দেখতে ভালোই লাগে । অফিস-ফেরত লোকজনদের ট্রাম-বাস ধরার ছুঁড়োছড়ি, মেয়েরা হাঁটছে পা টিপে টিপে, কাদা বাঁচাবার জন্য শাড়ি সামান্য উঁচু করে, অবিকল তিতির পাখির মতন...

হঠাৎ পিঠে একটা চাপড় খেয়ে চমকে উঠে দেখি রাহুলদা । পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, তাও ধোপ-দুরন্ত নয়, মুখে দেড় দিনের দাড়ি, পায়ে রবারের চটি । চমকে ওঠবারই কথা, রাহুলদা এমনিতে খুব সাহেব মানুষ, বিকেলবেলা চৌরঙ্গি পাড়ায় তাঁকে এই পোশাকে দেখতে পাবো, এমন আশাই করা যায় না ।

রাহুলদা বললেন, তুই যে চলে যাস নি, এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছিস, এটা মিরাকল্ ! সত্যি মিরাকল্ ! তুই আমার ডাক শুনতে পেয়েছিলি ?

ডাক শুনলেও সেটা যে রাহুলদার কণ্ঠস্বর সেটা আমি বুঝতে পারি নি, যে-ডেকেছিল সে যে ফিরে আসবে তেমন আশা করেও আমি এখানে দাঁড়িয়ে নেই । কেন যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি তা আমি নিজেই জানি না । হাসি-হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইলুম রাহুলদার দিকে ।

রাহুলদা বললেন, কতগুলো কয়েনসিডেন্স শোন । তিন চারদিন ধরে গাড়িটা খারাপ বলে আমি ট্রামে-বাসে ঘুরছি । কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভাররা অবনত্বাস ব্যবহার করে, বলে আমি পারতপক্ষে ট্যাক্সি চাপি না । তার চেয়ে ভিড়ের ট্রাম-বাস অনেক ভালো । গাড়িতে করে যদি যেতুম, তা হলে নিজে গাড়ি



চালাতে চালাতে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো তোকে হয়তো লক্ষ্যই করতুম না । অনেকদিন বাদে দোতলা বাসে চাপছি তো, তাই জানলার ধারে বসে চারদিক দেখতে দেখতে যাচ্ছি !

আমি বললুম, এদিকের রাস্তায় কত সব দেখার জিনিস থাকতে তুমি শুধু আমায় দেখতে পেলো ?

রাহুলদা এক হাতের আঙুলে অন্য হাতের আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, দু' নম্বর কয়েনসিডেন্স হলো, আজ আমি অফিস যাই নি, অফিসে গেলে বেরুতে বেরুতে আমার অন্তত সাতটা বেজে যায়, এ পথ দিয়ে আমি যাইও না ।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, পাজামা-পাঞ্জাবি পরে তুমি নিশ্চয়ই অফিসে যাও না ।

রাহুলদা বললেন, তারপর শোন, তিন নম্বর...আমি ঠিক যখন এখান দিয়ে পাস করছি, তখন মনটা খুব খচখচ করছিল । ভাবছিলুম, যদি চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা হতো, তক্ষুনি জানলা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখি যে মূর্তিমান নীলুচন্দর এখানে দাঁড়িয়ে, পা দুটো ক্রস করে কেঁটাকুরের মতন—

—মোটাই ওরকম ভাবে আমি দাঁড়াই না ।

—তুই কি নিজের দাঁড়বার ভঙ্গিটা দেখতে পাস ? তুই কি জানিস যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেই তোর চোখ ট্যারা হয়ে যায় ? যাকগে, সবচে বড় কথা কী জানিস, আমি পরের স্টপে বাস থেকে রিস্ক নিয়ে নেমে দৌড়োতে দৌড়োতে এলুম, এর মধ্যে, তুই যদি চলে যেতিস তাহলে একেবারে বোকা বনে যেতুম ।

—ব্যাপারটা কী বলো তো, রাহুলদা ? পরশুদিন তোমার সঙ্গে বাজারে দেখা হলো, তখন তো একটুও বুঝতে পারিনি যে আমার সঙ্গে তোমার এমন কিছু দরকারি কথা আছে ।

—পরশুদিন দরকার ছিল না । দরকারটা আজই । ঠিক দরকারও বলা যায় না, তোকে আমি একটা উপহার দিতে চাই ।

—উপহার ? আমাকে ? তোমার কম্পানির ক্যালেন্ডার চেয়েছিলুম একটা, তাও তুমি দিতে ভুলে গেছো ।

—ভালো করে মনে করিয়ে দিস নি কেন ? ঠিক আছে, দেবো, সেক্সট উইকে একবার অফিসে আসিস ।

—এই জুন মাসে আমি ক্যালেন্ডার নিয়ে কী করবো ?

—যাক গে যাক, সামনের বছরে পারি । জায়েরিও দেবো । শোন, তোকে আমার একটা উপকার করতে হবে । আমার দিদি জামাইবাবু হাওড়ায় থাকেন জানিস তো ? কাল সন্ধ্যাবেলা থেকে জামাইবাবু খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । ট্রান্সফার করতে হয়েছে পি. জি-তে । কাল প্র্যাকটিক্যালি সারারাত ছিলুম

হাসপাতালে । সাত বোতল রক্ত দিতে হয়েছে । জানিস তো আজকাল রক্ত জোগাড় করা কত শক্ত ।

—ও, এই ব্যাপার ! আমার ব্লাড গ্রুপ হচ্ছে ‘ও’, তাতে চলবে ? আমি রক্ত দিতে রাজি আছি ।

—তোর রক্ত কে চেয়েছে ?

—সাত বোতল লেগেছে, আরও যদি লাগে ? রক্ত দেওয়াটা আমার পক্ষে কিছুই না ।

—ধ্যাৎ ! শোন, তোকে আমি রবীন্দ্রসদনের একটা ফাংশানের দুটো টিকিট দেবো ।

—না, না, তোমায় কিছু দিতে হবে না । আমি তো এমনিই রক্ত দিতে রাজি আছি বললুম । রক্ত দিতে আমার ভালো লাগে । প্রত্যেকদিন ট্রামে-বাসে চাপতে কত রক্ত জল হয়ে যায়, রক্তিরবেলা মশারা কত রক্ত খেয়ে নেয়, তার চেয়ে কোনো অসুস্থ মানুষের জন্য রক্ত দেওয়া—

—কী আবোল-তাবোল বকছিস ! রক্ত দেবার কোনো কোয়েশেনই উঠছে না । আমি তোকে একটা ফাংশানের দুটো টিকিট দিতে চাই, ফ্রি ।

—ফ্রি তো বুঝলুম, কিন্তু তার বদলে ?

—তার বদলে তোকে কিছু করতে হবে না !

—এত খারাপ ফাংশান ? কিশোরকুমারের নাচ ?

—না, না, তা নয় । খুব ভালো ফাংশান ।

—ও বুঝেছি, তোমার চেনা কেউ গান গাইবে ? তোমার মেয়ে ?

—শোন নীলু, আমার বেশি সময় নেই, আমাকে এক্ষুনি আবার যেতে হবে পি.জিতে । তোকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলছি । আজই সাতটার সময় রবীন্দ্রসদনে একটা চ্যারিটি শো আছে । সুচিত্রা মিত্র, ঋতু গুহর গান আছে, আরও কী সব ভ্যারাইটি পারফরমেন্স । একটা মুক-বধির বিদ্যালয়ের জন্য টাকা তুলছে, ওরা আমার অফিসে এসে খুব করে ধরেছিল, আমাকে একশো টাকার দু’খানা টিকিট গছিয়েছে । কম্পানির অ্যাকাউন্ট অবশ্য, কিন্তু ভালো একটা কাজ, ভালো ভালো আর্টিস্ট আছে, ভেবেছিলুম আমি নিজেই যাবো । হঠাৎ জামাইবাবুর এরকম অসুখ হলো । টিকিট দুটো নষ্ট হবে, তাই আমি পকেটে নিয়েই বেরিয়েছি । তোকে পেয়ে গেলুম, তুই যা !

—কেন, হাসপাতাল ঘুরে, তারপর তুমি চলে যাও ?

—তোর মাথা খারাপ হয়েছে ? বসন্তদার এরকম ক্রিটিক্যাল অবস্থা, এর মধ্যে আমি নাচ-গান শুনতে যাবো ? আজও কতক্ষণ হাসপাতালে থাকতে হয়

ঠিক নেই।

—কিন্তু...কিন্তু...একশো টাকার টিকিটে আমি যাবো ?

—তোর তো এক পয়সাও লাগছে না।

—সেজন্য না। একশো টাকার টিকিট নিশ্চয়ই খুব সামনের দিকে ?

—একেবারে ফ্রন্ট রো। এই দ্যাখ, ‘এ’ দিয়ে নাম্বার।

—সেখানে আমি যাবো ? এই চেহারা আর এই পোশাকে ? চাকর-বাকর ভেবে আমার মাথায় চাঁটি মেরে উঠিয়ে দেবে না ?

রাহুলদা এবারে আমার আপাদমস্তক দেখলেন, চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে গেল, মাথাটা একদিকে হেলিয়ে বললেন, তোর চেহারাটা...পোশাক তো মোটামুটি ঠিকই আছে, প্যান্টের সঙ্গে চটি পরে বেরোস কেন, শু পরতে পারিস না ? যাক গে, এতেই চলে যাবে। তোর কাছে তো টিকিট থাকছে।

আমি বললাম, টিকিট থাকলেই বা। যদি ওরা ভাবে আমি এত দামী টিকিট পকেট মেরেছি ! না, না, ওসব ঝঞ্জাটের মধ্যে আমি যেতে চাই না। শুধু শুধু যেচে অপমান নেওয়া।

রাহুলদা ক্ষুণ্ণভাবে বললেন, একশো টাকার টিকিট...নষ্ট হবে ? তা ছাড়া, চারিটি শো-এর টিকিট কেটে না-যাওয়াটা অত্যন্ত অভদ্রতা। এদের প্রোগ্রামও খুব ভালো।

—তুমি তো হাসপাতালে যাচ্ছেই, ওখানে চেনাশুনো আর কারকে পেয়ে যেতে পারো। তাদের দিয়ে দিও !

—তোর কোনোদিন বুদ্ধি হবে না, নীলু ! হাসপাতালে কেউ বেড়াতে আসে না। ওখানে যারা যায়, তাদের থিয়েটার-জলসার টিকিট দেওয়া যায় না। টিকিটটা যে আজকেরই, এক ঘণ্টা বাদে...তোর জন্য আমি বাস থেকে নামলুম, আর তুই এরকম করছিস ? আমি তো বলছি, তোর কোনো ভয় নেই, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না, তুই চলে যা !

রাহুলদা প্রায় জোর করেই আমার হাতে টিকিট গুঁজে দিলেন। একটা নয়, দুটো। দুশো টাকা ! ওফ, এই দুশো টাকা পেলে আমি কত কাজে লাগাতে পারতুম !

—একটা টিকিট তো তবু নষ্ট হবে !

—এখনো প্রায় সোওয়া ঘণ্টা আছে, এর মধ্যে তোর কোনো বান্ধবী জোগাড় করতে পারবি না ? তুই কী রে, ইয়াংম্যান, তোর মতন বয়েসে আমরা...

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে রাহুলদা আবার বললেন, আমি আর দেরি করতে পারছি না। তুই দ্যাখ কাকে জোগাড় করতে পারিস। আর শোন, এই দশটা টাকা রাখ,

তোর বান্ধবীকে কোন্ড ড্রিংগ আর বাদাম খাওয়াতে হ'ল তো...

আমার বুক পকেটে দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে রাহুলদা হনহনিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গেলেন ।

পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতন দুশো দশ টাকা ! অবশ্য টিকিট দুটোর দাম দুশো টাকা হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই মূল্যহীন কাগজের টুকরো হয়ে যাবে । অর্থাৎ ঐ দুটো কারেন্সিও নয়, প্রমিসারি নোটও নয়, যা দাম লেখা আছে তার সমমূল্যের বস্তুও নয় । তা হলে অর্থনীতির ভাষায় একে কী বলে ? কিছু একটা বলে নিশ্চয়ই, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকারটাই বা কী ! সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক হয়, কিন্তু এই সব ফাংশানের টিকিট এমনকি যথা দামেও বাইরে দাঁড়িয়ে বিক্রি করা যায় ? সন্দেহ আছে । কিশোরকুমার নাইট হলেও তবু কথা ছিল । চ্যারিটি শো-এর টিকিট কাউন্টারে দিয়ে দাম ফেরত চাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না ।

অর্থাৎ এই দশ টাকাটাই আসল টাকা । তাই-ই বা মন্দ কী ? টিকিট দুটো অনায়াসে ছিড়ে ফেলা যেতে পারে ।

কিন্তু এই চ্যারিটি শো-এর উদ্যোক্তারা যদি রাহুলদার চেনা হয়, তা হলে পরে হয়তো অনুযোগ করবে । সামনের সীট খালি পড়ে থাকলে ওরা লক্ষ্য করবে নিশ্চয়ই । তা হলে কিছুক্ষণের জন্য যাওয়া যেতে পারে । সুচিত্রা মিত্র, ঋতু গুহ'র গান শোনা যাবে...আগামী সন্ধ্যাটিতে আমার মূল্যবান কিছু কাজ নেই...নাচ-গানের অনুষ্ঠান দেখার জন্য দশ টাকা মজুরি পাওয়া গেল !

দ্বিতীয় টিকিটটা কী হবে ? আমার বান্ধবীর সংখ্যা অসংখ্য, এমনকি অকালে দেহান্তরিতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও আমার বান্ধবী ছিলেন । আমার বর্তমান বান্ধবীদের মধ্যে আছে অপর্ণা সেন, মেরিল স্ট্রিপ, শাবানা আজমী, বচ্ছেন্দ্রী পাল, অনীতা দেশাই, মল্লিকা সারাভাই, সাঁওতাল পরগনার ফুলমনি...এরকম আরও কত নাম করা যায়, একা একা এদের সঙ্গে আড্ডা মেরে আমার কত সময় কেটে যায়, কিন্তু এখন এদের কারকে পাওয়া মুশকিল ।

রাস্তা দিয়ে যে-সব মেয়েরা একলা একলা হেঁটে যাচ্ছে,...ঐ যে নীল শাড়ি পরা মেয়েটি, হাতে একটি ব্রাউন প্যাকেট, অন্যমনস্ক চোখ, ওকি আমার বান্ধবী হতে পারে না ? ওর সামনে গিয়ে বলা যায় না, আপনার কি আজ সন্ধ্যাবেলা বিশেষ কোনো কাজ আছে ? চলুন না, আমরা একসঙ্গে রবীন্দ্রসদনে একটা জলসা শুনতে যাই ?

আমার এই নির্দোষ প্রস্তাব পুরোপুরি পেশ করার আগেই হয়তো মেয়েটির চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠবে । গল্পের বই-এর নায়িকাদের মতন চটি খুলে মরতেও

পারে। আজেবাজে পুরুষরাই মেয়েদের এরকম তিরিষ্কি করে দিয়েছে। কিংবা ভীতু। ভয় থেকেও অনেক সময় রাগ আসে।

চড়াং করে একবার বিদ্যুৎ বলকাবার পর খেয়াল হলো যে একটু আগেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি নেমে গেছে। তুষারপাতের মতন মিহি ও শব্দহীন। এর চেয়ে যদি বেড়ে যায় তা হলে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত পৌছোতেই পারবো না। এখান থেকে বাসে মাত্র একটি স্টপ। এই ভিড়ের বাসগুলির কোনো একটায় ঠেলেঠেলে উঠতে পারলে, এক স্টপের মধ্যে ভাড়া দেওয়া যাবে না। লোকে ভাববে জোচ্চোর। শুধু এক স্টপ যাওয়ার জন্য ভাড়া দেবোই বা কেন?

হনহন করে হাঁটিতে শুরু করে দিলুম।

এইবার মনে পড়লো, আমার একটা খুচরো কাজ ছিল। আমার ছোটমামা একটা রেকর্ড প্লেয়ার বিক্রি করবেন, তাই সেই ব্যাপারে আমাকে বলেছিলেন, নীলু, একটু খোঁজ-খবর নিয়ে দেখবি, তোর তো অনেক চেনাশুনো, যদি কেউ নিতে চায়...

ক্যাসেটের যুগ এসেছে, রেকর্ড প্লেয়ারের গৌরবের দিন শেষ। এখন ঐ যন্ত্র সেকেণ্ড হ্যান্ড কে আর কিনবে, বিক্রিই করতে চায় সবাই। কিন্তু ছোটমামা তা বুঝতে চান না, তাঁর ধারণা নর্থ ক্যালকাটার লোকেরা এখনও বড় বড় রেকর্ড চালিয়ে গান শুনতে ভালোবাসে।

ছোটমামাকে সাঙুনা দেবার জন্যই বলেছিলাম, ঠিক আছে, বুধবার সন্ধ্যাবেলা গিয়ে তোমার ওটা কী কণ্ডিশনে আছে দেখে আসবো!

এমন কিছু ব্যাপার নয় যে ছোটমামা-মামি আমার প্রতীক্ষায় সারা সন্ধ্যা বসে থাকবে। বড়জোর রাত্তিরে খেতে বসে ছোটমামা বলবে, নীলুটা আজ আসবে বলেছিল, এলো না! ওর কোনো কথার ঠিক নেই, এই জন্যই তো কাজ-কন্ঠো কিছু জোটে না!

ছোটমামার বাড়ি হাজরা মোড়ের কাছেই, এখনো চট করে ঘুরে আসা যায়। কিংবা টিকিট দুটো ওদের দিয়ে দিলে কেমন হয়। আমার এই মামা-দম্পত্তি বেশ কালচার ভক্ত। প্রায়ই মুখে পাউডার মেখে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে যায়, একশো টাকা দামের দু'খানা টিকিট পেলে খুশি হবে নিশ্চয়ই! আমারও প্রেস্টিজ বাড়বে। ওরা বুঝবে যে আমি শুধু সব সময় নিই না, কিছু দিতেও পারি।

কিন্তু রাহুলদা আমায় দশ টাকা বকশিস দিয়েছেন, পরে রিপোর্ট চাইবেন...অবশ্য সীট দুটো ভর্তি করা নিয়ে কথা...

সিদ্ধান্ত বদলাবার আর সময় পাওয়া গেল না, ইলশেঙুড়ি বৃষ্টি হঠাৎ কুকুর-বেড়াল হয়ে গেল, আমি পকেট চেপে ধরে দৌড়ে পৌছে গেলুম

রবীন্দ্রসদনে ।

আরম্ভ হতে এখনো ঢের দেরি আছে, দর্শকদের মধ্যে আমিই প্রথম উপস্থিত । একশো টাকার টিকিটের কী হেনস্থা ! যারা এত দামী টিকিট কাটে, তারা অনুষ্ঠান শুরু হবার দশ-পনেরো মিনিট পরে পৌছোয় এবং গাড়িতে আসে ।

উদ্যোক্তারা অবশ্য এসে গেছে, খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, তারা মঞ্চ সাজাচ্ছে ফুল দিয়ে । দু'একজন লবিতে সাঁটছে পোস্টার । আমার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে দু' একবার...ঠিক বুঝতে পারছে না আমি কে...

হঠাৎ মনে হলো, আমার জীবনে আজকে বিশেষ কিছু একটা ঘটবে ! চলন্ত বাস থেকে রাহুলদার নেমে পড়া...আমার কাছে একশো টাকার দু' খানা টিকিট...আমি এখানে একঘণ্টা আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছি...এর কি কোনো মর্ম নেই ! প্রতিদিনের ঘটনার সঙ্গে তো এসব মেলে না ! হয়তো এমন কেউ আসবে, যে আমার জীবনটা বদলে দেবে । একজন কেউ এসে বলবে, আমি তোমায় চিনতে পেরেছি, নীলু ! সবাই শ্রোতের শ্যাওলার মতন তোমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, কিংবা কৃপা করে তোমাকে দিতে চায় ছিটেফোঁটা সাহায্য, কিন্তু আমি ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়ে দেখেছি তোমার হৃদয়...

এক এক করে আসতে লাগলো লোকজন । গাড়িতে কিংবা ট্যাক্সিতে; বাস থেকে নেমে বৃষ্টির মধ্যে ছুটতে ছুটতে একজনকেও আসতে দেখা গেল না । এরা সবাই ঘাম ঘাম পাটি, অন্য কারুর দিকে দৃকপাত না করে সোজা হেঁটে যায়...সুসজ্জিতা মহিলারা নিজের নাকটা দেখতে ভালোবাসেন । সকলেরই সাজগোজের খুব বহর । এটা বেশ উচ্চাঙ্গের চ্যারিটি শো বোঝাই যাচ্ছে ।

একজনও আমার চেনা মানুষ চোখে পড়লো না । এমনকি কেউ আমার আধো চেনাও নয়, আমার দিকে কেউ সামান্য ভুরুও তোলে না । কেউ অতিরিক্ত টিকিটের খোঁজ করলে একশো টাকার একখানা টিকিট বিনামূল্যে আমি দিয়ে দিতে পারি, সেরকমও কেউ নেই ।

তা হলে সে কোথায় ! যে আমার জীবন বদলে দেবে ? তবে কি আমার পাশের সীটেই এসে সে বসবে হঠাৎ ?

সেকেণ্ড বেল বাজা পর্যন্ত অপেক্ষা করলুম । নাঃ, কেউ এলো না । একখানা টিকিট তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফেলে দিয়ে আর একখানা নিয়ে ঢুকে পড়লুম । দু' পাশের লোকেরা এবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখুক, এতক্ষণ যাকে তারা গ্রাহ্য করে নি, সে এখন গিয়ে বসবে ফ্রন্ট রো-তে !

যে লোকটি টিকিট ছিড়লো, যে-লোকটি টর্চ হাতে আনায় সীট দেখাতে

এলো, ওরা কি সন্দেহের চোখে তাকিয়েছে আমার দিকে ? আমার কিছু যায় আসে না ! মঞ্চে এখন যে বাজনা বাজছে, তা যেন আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যই ।

যথারীতি সামনের সারি প্রায় ফাঁকা । আমার ডান পাশে বা বাঁ পাশে চার-পাঁচখানা সীটের মধ্যে কেউ নেই । খেলা যখন শুরু হবে, তখন অন্ধকারের মধ্যে কেউ সারা গায়ে সুগন্ধ মেখে আমার একপাশে বুপ করে বসে পড়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করবে, কেমন আছো, নীললোহিত ?

খেলা শুরু হয়ে গেল, কেউ এলো না । রাহুলদা বেশি বেশি বাড়াবাড়ি করছিলেন । সামনের দিকের প্রথম দু'সারির অনেকেই আসে না । কিছু কিছু নিশ্চয়ই কমপ্লিমেন্টারি কার্ড থাকে । সুভেনিরে যারা বিজ্ঞাপন দেয়, তারাও নিশ্চয়ই ফ্রি কার্ড পায় । রাহুলদার দু' খানাও সেরকম নাকি ? কিন্তু কার্ড নয়, টিকিট, তাতে আমি একশো টাকা দাম লেখা দেখেছি । নিশ্চয়ই একশ্রেণীর মানুষ আছে, যারা চ্যারিটির জন্য একশো টাকা দিতে পারে । কিন্তু দু' তিন ঘণ্টা সময় দিতে পারে না ।

উদ্বোধনী সঙ্গীত, তারপর বক্তৃতা, তারপর মাল্যদান, তারপর বক্তৃতা, তারপর বক্তৃতা, এ সব কিছুই আমার কানে গেল না, আমি শুনতে না চাইলে কেউ জোর করে কিছু আমাকে শোনাতে পারে না । সে আমার নিজস্ব ব্যবস্থা আছে । বিনা ডাক টিকিটে মনকে আমি যখন তখন দূরে পাঠিয়ে দিতে পারি । এমনকি স্বর্গেও ।

সুচিত্রা মিত্র, ঋতু গুহ'র গান নিশ্চয়ই শেষের দিকে হবে । ওঁরাই তো তুরুপের তাস । তার আগে কবিতা পাঠ, অতুলপ্রসাদের গান, যুগ্ম নৃত্য । আমি মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দর্শক-দর্শকাদের দেখছি । স্টেজে এক একজন নতুন শিল্পী এলেই হলের এক অংশে মৃদু গুঞ্জন উঠছে । অর্থাৎ এক একজন শিল্পীর আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা যথেষ্ট । এখানে আমার একজনও চেনা নেই ? এই একাকিত্ব অসহ্য লাগে ।

কুম-কুম শব্দে মঞ্চের ওপর মুখ ফেরালুম । এবারে যুগ্ম নৃত্য, কিংবা একটা কোনো নৃত্যনাট্যের অংশ, রাজকুমারী ও বিদেশী পথিক, দুটিই যে মেয়ে তা স্পষ্ট বোঝা যায় । তবে ওরা কিশোরী না যুবতী তা বোঝবার উপায় নেই । মেয়েরা ছেলে সাজলে আমার দেখতে ভালো লাগে । পথিক-সাজা মেয়েটি আবার গৌঁফ ঝুঁকছে, বুকের দু' পাশ উঁচু হয়ে আছে যদিও । অন্য মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলুম ।

সত্যিকারের রাজকুমারী তো আমরা কেউ দেখিনি । এই ভারতবর্ষে আর

কোনোদিন দেখতেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ মেয়েটি যেন নেমে এসেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। কোনো জলসায়, নাচগানের আসরে তো এরকম কোনো মেয়েকে কখনো দেখা যায় না।

মেয়েটি কতখানি সুন্দরী তা আমি বলতে পারবো না। রূপের বিচার আমি করতে জানি না। তাছাড়া মঞ্চের মেয়ের অনেকখানিই তো সাজ-পোশাক। আমাকে চুষকের মতন টানছে ওর চোখ দুটি। এরকম সারল্য ও বিস্ময়-মাখা চোখ এখনো আছে এই পৃথিবীতে! মেয়েটা কলকাতা শহরেই থাকে নিশ্চয়ই, এই শহর এর মধ্যে একবারও ওকে আঁচড়ে দেয়নি?

নাচ তো তেমন বুঝি না। ওদের নাচ কতটা উচ্চাঙ্গের তা কে জানে! লম্বা চুলওয়ালা একজন তবলচি বাঁয়া-তবলা পিটিয়ে যাচ্ছে মনের সুখে। নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে গান। মেয়ে দুটি নাচছে সারা স্টেজ জুড়ে। রাজকুমারীর চোখের দিকে যতবার চোখ পড়ছে, ততবারই কৈপে উঠছে আমার বুক। বুকের এরকম ব্যবহারের মানে কী? আমি প্রেমে পড়ে গেলুম নাকি?

অঙ্ককারে খুব উপভোগের সঙ্গে হাসলুম। এই সব ব্যাপারগুলো একা না থাকলে ঠিক মৌজ করা যায় না। আমার পাশে চেনা কেউ বসলে তার সঙ্গে গল্প করতুম, এতখানি মনোযোগ দিতুম না এই নাচের দিকে। বুক কাঁপতো না। ইচ্ছে করে কেউ নিজের বুক কাঁপাতে পারে না। আকাশ থেকে দেবাৎ কখনো কখনো নেমে আসে বুক কাঁপার মুহূর্ত।

আমি রাজকুমারীকে দেখছি কিন্তু সে আমাকে দেখছে না। মঞ্চ থেকে সব কিছুই অঙ্ককার দেখায়। তাছাড়া ওর চোখ দূরের দিকে।

মেয়েটির নাম কী? বাইরে দু'জন মহিলা স্যুভেনির হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু পাঁচ টাকা করে দাম! পাঁচ টাকা খরচ করে ঐ পচা জিনিস কিনতে আমার বয়ে গেছে। একশো টাকার টিকিটে এসেছি। আমাকে ঐ স্যুভেনির একখানা বিনামূল্যে দেওয়া উচিত ছিল না!

নাচটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল, যাবার সময় সেই রাজকুমারী আবার আমার বুক কাঁপিয়ে গেল। মোট তিনবার। তাহলে ব্যাপারটা বেশ গুরুতর। ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না? আমি যদি কেউকেটা হতুম, তাহলে ইন্টারভ্যালের সময় মঞ্চে উঠে গিয়ে উদ্যোক্তাদের কারুককে জিজ্ঞেস করতে পারতুম, ঐ যে রাজকুমারী সেজে নাচলো, ঐ মেয়েটি কে? দিব্যি নাচ শিখেছে তো। কই, ওকে একবার ডাকো তো! মেয়েটি লাজুক লাজুক মুখ করে এসে দাঁড়ালে...

আমি একশো টাকার টিকিটের খাঁটি অধিকারী হলে উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই কেউ না কেউ চিনতো। রাহুলদাকে যে টিকিট বিক্রি করে গেছে, সে কি এসে একবার

অন্তত দেখা করে যেত না ! মেয়েটি নিশ্চয়ই এখন সাজপোশাক খুলছে । একটু পরে যদি চলে যায়, তাহলে আর দেখা হবে না সারা জীবনে !

মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল । সব দোষ রাহুলদার ! কী দরকার ছিল এখানে আসবার, সেধে সেধে দুঃখ পাওয়া । এর পর শুরু হলো নজরুলের একটা লম্বা কবিতার আবৃত্তি... ।

মিনিট পনেরো বাদে আবার চমকে উঠলুম । সাত-আটটি ছেলেমেয়ে কোরাস গাইতে এসেছে । তাদের মধ্যে রাজকুমারী না ? পোশাক বদলে এসেছে । মাথায় মুকুট নেই । শরীরে ফুলের অলংকার নেই, তবু মুখটা দেখলে ঠিকই চেনা যায় । বাঃ, যাকে দেখে বুক কাঁপলো, তার মুখ কি আর সারা জীবনে ভুলতে পারি ?

কোরাস গানের সময়ও আলাদা করে গলা চেনা যায় । তার জন্য বিশেষ অধ্যবসায়ের দরকার । আগে নিজের আত্মাকে দু'চোখের মণিতে আনতে হয় । তারপর শুধু একজন ছাড়া আর সবাইকে মুছে ফেলতে হয় । আমি রাজকুমারীর চোখে চোখ রেখে ধ্যানস্থ হলুম । না, মেয়েটি এখন আর রাজকুমারী নয়, তবু, ঝলমলে সাজপোশাক খুলে এলেও ওর চোখের সেই দৃষ্টিটা পাল্টায় নি । ঐ দৃষ্টির জন্যই তো অনন্যা ।

আস্তে আস্তে তরল হয়ে গেল মঞ্চটা । ঐ যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে বাঁ দিক থেকে তৃতীয় । থুতনিটা একটু উঁচু করে আছে । দুটো হাত সামনের দিকে বাড়ানো...আর সবাই মিলে গেল, অমনি আমি অন্য সব শব্দের মধ্যে থেকে হেঁকে শুধু একজনের গলাই শুনতে পেলুম । ওর চোঁট নড়ছে, আমি শুনছি একক সঙ্গীত । খুব একটা দারুণ কিছু গায় না । চলনসই বলা যেতে পারে । কিন্তু খুব তন্ময় হয়ে আছে... । আমার আর একবার বুক কেঁপে উঠলো ।

অনেক আশা করেছিলুম, আজ সন্ধ্যাবেলা আমার জীবনে একটা কিছু ঘটবে । সেরকম কিছুই ঘটলো না । শুধু কয়েকবার বুক কাঁপলো, তা-ও এমন একজনকে দেখে, যে আমার দিকে একবারও তাকিয়ে দেখেনি । যে সারা জীবনও আমার কথা জানতে পারবে না ।

॥ ২ ॥

তপন বললো, হ্যাঁ, আমি তোঁর রেকর্ড প্লেয়ারটা কিনতে পারি, যদি তুই ওটা অন্য এক জায়গায় ডেলিভারি দিয়ে আসতে পারিস ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, হ্যাঁ, রাজি আছি । কোথায় পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, বল !

তপন মিটিমিটি হেসে বললো, ঠিক দিয়ে আসবি তো ?

এর আগে আমি ছোটমামার এই রেকর্ড প্লেয়ারটা অন্তত সাতাশজনকে গছাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। কয়েকজন তো পান্ডাই দিতে চায় নি। কয়েকজন ঠাট্টা করে বলেছে, এই জাংক্টা কোথা থেকে তুলে আনলি ? নিলয়দা বলেছিলেন, আমার বাড়িতে ওরকম একটা পড়ে আছে, তুই নিয়ে যেতে পারিস। ফ্রি।

এদিকে ওটাকে উপলক্ষ করে আমার ছোটমামার সংসারে গৃহশান্তি নষ্ট হবার উপক্রম। নতুন মামীমা চান একটা টু-ইন-ওয়ান কিনতে। কিন্তু ছোটমামা খুব দ্বিষ্ট প্রিন্সিপালের মানুষ। পুরোনটা বিক্রি না করে নতুন কিছু কিনবেন না। টাকার প্রশ্ন নয়, নীতির প্রশ্ন। ফলে ও বাড়িতে গানের বদলে সর্বক্ষণ ঝগড়া শুনতে পাওয়া যায়।

ছোটমামা আবার নিজের মুখে কারুকে ওটা বিক্রির কথা বলতে পারবেন না, তাতে তাঁর সম্মানে লাগে। ফলে, আমিই তাঁর একমাত্র সেলসম্যান। এর মধ্যে আমি কিছু কিছু সেলসটক রপ্ত করে ফেলেছি। প্রথমেই ক্যাসেটের নিন্দে করতে শুরু করি। বাজারে অধিকাংশ ক্যাসেটই ভেজাল। প্রি-রেকর্ডেড যে-সব গানের ক্যাসেট সস্তায় কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলো শুনলে মানুষ দিন দিন অসুর হয়ে ওঠে। আর যে-হেতু ব্যাড কয়েনস ড্রাইভ আউট গুড কয়েনস্, সেই রকমই ভেজাল ক্যাসেটের অত্যাচারে খাঁটি ক্যাসেট বাজারে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। রেকর্ড হচ্ছে খানদানি জিনিস। খাঁটি মিউজিক, সুস্বাদু সুরের কাজ শুনতে হলে এখনো রেকর্ড ছাড়া উপায় নেই...

তপনের ওপর আমি বিশেষ ভরসা করি নি। তপন আমার চেয়ে বছর চারেক মাত্র বড়। কিন্তু ছেলেবেলায় একসঙ্গে ফুটবল খেলেছি বলে ওকে আমি নাম ধরেই ডাকি। যদিও আমার তুলনায় তপন অনেক উঁচুতলার মানুষ। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেই ভালো চাকরি পেয়েছে। এর মধ্যে জাপান ঘুরে এলো একবার। তাছাড়া প্রায়ই দিল্লি-বোম্বাই যায় অফিসের কাজে। গত বছর বিয়ে করেছে, স্বশ্রের কাছ থেকে গাড়ি পেয়েছে। সে সেকেন্ড হ্যাণ্ড কোনো জিনিস কেনার খদ্দের নয়। এমনিই এ পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে তপনকে একবার বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম।

তপন এখনও রেকর্ড প্লেয়ারটা চোখেই দেখেনি। তবু রাজি হয়ে গেল ? দামও জানতে চায় নি।

তপন একটা প্যাড টেনে নিয়ে বললো, তাহলে তোকে আমি ঠিকানাটা দিয়ে দিচ্ছি। যাওয়া-আসার খরচও আমি দেবো। তোকে শুধু পৌঁছে দিয়ে আসতে

হবে ।

—যাওয়া-আসার খরচ দিতে হবে না । কিন্তু তুই জিনিসটা আগে দেখবি না ?

—তোর মুখের কথা আমি অবিশ্বাস করবো ? তুই তো বলছিস যন্ত্রটা চালু অবস্থায় আছে !

—হ্যাঁ । চালু তো আছেই, খুব ভালো কম্পানির জিনিস । অ্যাজ গুড অ্যাজ নিউ । সঙ্গে চারখানা রেকর্ড ফ্রি ।

—তবে তো আর কোনো কথাই নেই । কত যেন দাম বললি ?

—জিনিসটা তো আমার নিজের নয়, ছোটমামার । উনি সাড়ে সাত শো চাইছেন । অবশ্য বলে-কয়ে...

—ঠিক আছে । আমি চেক লিখে দিচ্ছি । কার নামে লিখবো, তোর নামে ?

—না, না, আমার নামে না । আমার কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই । ছোটমামার নামে লিখতে হবে ।

—তোর নামে চেক নিবি না ? তা হলে তুই তোর কমিশান পাবি ?

—কমিশান ? আমার ছোটমামার কাছ থেকে আমি কমিশান নেবো নাকি ? যাঃ !

আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে তপন বললো, নীলু, তুই আর মানুষ হলি না ! এই জন্য তোর কিছু হবে না । আজকালকার দিনে ছোটমামা-বড়মামা, কাকা-জ্যাঠা যেই-ই হোক, তুই কারুর হয়ে একটা কাজ করে দিলে তার পারিশ্রমিক নিবি না ? তুই যে এতটা সময় নষ্ট করছিস, তার কোনো দাম নেই ?

আমিও হাসলুম । খুব বড়লোকদের মতন আমি একটা জিনিসই যত ইচ্ছে খরচ করতে পারি, সেটা হচ্ছে সময় । সুস্থ অবস্থায় গোটা একটা দিন বিছানায় শুয়ে পা নাড়ালেও কেউ আমায় কিছু বলবে না । কটা বড় লোক এই আরাম উপভোগ করতে পারে !

তপনকে বললুম, চেকটা তুই আমার ছোটমামার নামেই লিখে দে । কারুকো খুশি করতে পারাও তো অনেক কিছু পাওয়া । তাছাড়া, এরপর যখন তখন নতুন মামীমার কাছে খিচুড়ি খেতে চাইলেও মনের মধ্যে কোনো গ্লানি হবে না ।

তপন প্রথমে চেকটা লিখলো, তারপর একটা কাগজে একটা ঠিকানা লিখে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কবে যেতে পারবি, বল ?

ঠিকানাটা দেখে আমি থঃ —

অনুপমা সেন

রাজার বাঁধ

ভায়া ইব্রাহিমপুর
জেলা : বীরভূম।

চোখ কপালে তুলে আমি জিজ্ঞেস করলুম, রেকর্ড প্লেয়ারটা বীরভূমে পৌঁছে দিতে হবে ?

তপন একগাল হেসে বললো, তুই কথা দিয়েছিস, নীলু। সেই অনুযায়ী ডিল হয়েছে। চেক লিখে ফেলেছি। এখন ব্যাক আউট করতে পারবি না!

—অত দূরে যেতে হবে! বলিস নি তো আগে?

—সেই জনাই তো তোকে ভাড়া অফার করেছি। এটার জন্য যখন তুই কোনো কমিশান পাবি না, তোর আমি ক্ষতি করতে চাই না। ভাড়া-টাড়া সব দিয়ে দেবো। যা না ঘুরে আয়। তোর ভালো লাগবে।

—এই অনুপমা সেন কে?

—আমার প্রথম প্রেমিকা। বিবাহিতা মহিলা...আমার নাম করে তোকে চুপি চুপি দিয়ে আসতে হবে। দেখিস, অন্য কেউ যেন টের না পায়।

—ভাই তপন, আমি ওসব ঝঞ্জাটে যেতে চাই না!

তপন এমন হাসতে লাগলো যেন খুব একটা মজা পেয়েছে। আমার প্রায় সব কথাতেই হাসছে—আমি কি চার্লি চ্যাপলিন নাকি?

—দ্যাখ নীলু। তোর কাছ থেকে সাড়ে সাত শো টাকা দিয়ে আমি যেটা কিনলুম, সেটা কোনো রেকর্ড প্লেয়ার নয়। সেটা একটা আইডিয়া। তোর কথা শোনা মাত্র আমার মাথায় আইডিয়াটা এলো। সেজন্য তোকে ধন্যবাদ। এখন তুই যদি এই জিনিসটা বীরভূমে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারিস, তা হলে আমি যথার্থ খুশি হবো। তুই তোর মামা-মামীমাকে খুশি করার জন্য এত পরিশ্রম করছিস, তুই আমার জন্য এইটুকু করবি না?

—ভাই তপন। তোকে খুশি করার জন্য আমাকে বীরভূমের এক গ্রামে মার খেতে পাঠাবি। এটা কি ঠিক? শুনেছি বীরভূমের লোকেরা লাঠির বদলে লোহার শাবল-টাবল দিয়ে মারে!

তপন আর একগাল অট্টহাসি চালালো। ও যেন আজ হাসি দিয়ে গলা সাধছে।

সিগারেটের প্যাকেট বার করে আমাকে একটা দিয়ে খানিকটা শান্ত হয়ে বললো, নীলু, তোর জীবনের প্রথম প্রেমিকা কে ছিল আমি জানি না। কিন্তু আমার জীবনের প্রথম প্রেমিকা আমার মা। মাকে আমি পাগলের মতন এখনও ভালোবাসি। অনুপমা নামটা শুনলে ঠিক মা মা মনে হয় না। তাই না? কিন্তু

আমাদের মায়েরাও এক সময় আধুনিকা ছিল। মাত্র বারো-চোদ্দ বছর আগেও আমার মা সেজেগুজে বাবার সঙ্গে পাটিতে যেতেন। আমার মাকে তো তুই দেখেছিস ?

আমি মাথা নাড়লুম। তপনের মাকে আমি কাকিমা বলে ডেকে এসেছি। কোনোদিন তাঁর নাম জানার প্রয়োজন হয়নি।

তপন আবার বললো, বাবা মারা যাবার পর মা নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছে। আমার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে জানিস তো ? আমি বিয়ে করার পর মা হঠাৎ ঠিক করলো আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকবে। তা বলে ভাবিস না আমার বউয়ের সঙ্গে মায়ের ঝগড়া হয়েছে। টুনটুনির সঙ্গে আমার মায়ের খুব ভাব। কিন্তু মায়ের ধারণা শাশুড়ি-বৌয়ের অনেকদিন ভাব রাখতে গেলে একটু দূরে দূরে থাকা দরকার। আমি আর টুনটুনি মাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি। মা তবু জেদ করে গ্রামে চলে গেল। সে বাড়ি ভাঙাচুরো অবস্থায় পড়েছিল, সারিয়ে-টারিয়ে নেওয়া হয়েছে বটে। কিন্তু মা সেখানে একলা একলা থাকবে। এটা ভাবলে আমাদের ভালো লাগে ?

আমি বললুম, সেইজন্যই কাকিমাকে অনেকদিন দেখিনি।

—মা বছরে একবার কলকাতায় থাকবে ঠিক করেছে। তার ফলে আমাদেরই এখন গ্রামে যেতে হয়।

—তুই মাঝে মাঝে যাস ?

—হ্যাঁ, যাই, কিন্তু অফিসের কাজকর্ম থাকে, কত আর ঘন ঘন যাওয়া যায় বল। আমাদের কাজে শনি-রবিবারেও ছুটি নেই। আমি আর টুনটুনি গত মাসেই গিয়েছিলুম।

—তুই আবার যখন যাবি, তখন নিয়ে যাস রেকর্ড প্লেয়ারটা।

—আমার কথাটা শোন, নীলু। গত মাসে যখন গেলুম, তখন একটা জিনিস দেখে আমার খটকা লেগেছিল। মা সব সময় রেডিও চালিয়ে রাখে। এমনকি রান্নাঘরে রান্না করার সময়েও পাশে রেডিও চলে। আগে কোনোদিন মায়ের রেডিও শোনার এত শখ দেখিনি। এখন একা একা থাকেন তো, কথা বলারও কোনো সঙ্গী নেই। তাই রেডিওর শব্দটাই...কিন্তু সারাদিন ধরে রেডিও প্রোগ্রাম শোনা কী কষ্টকর ভেবে দ্যাখ ! যা সব অসহ্য প্রোগ্রাম হয়...

—গ্রামে থাকলেই সবাই রেডিও বেশি শোনে।

—কিন্তু আমার মা তো গ্রামের মেয়ে নয়। আমার বাবার দেশ বীরভূমে কিন্তু মামাবাড়ি ভবানীপুরে। তুই যখন এ রেকর্ড প্লেয়ারটার কথা তুললি, অমনি চট করে মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। মাকে যদি এটা পাঠানো যায়, আর

কিছু কিছু রেকর্ড, তা হলে মা ইচ্ছে মতন গান-বাজনা শুনতে পারে। মা অতুলপ্রসাদের গান খুব ভালোবাসে। রেডিওর গান-বাজনা তো বেশির ভাগ সময়েই—

—কিন্তু জিনিসটা তুই নিজে গিয়ে দিয়ে এলে ভালো হতো না ?

—শোন, আমার বাড়িতে একটা প্রায় নতুন রেকর্ড প্লেয়ার আছে। সেটাই তো মাকে দিতে পারতুম, পারতুম না ? কিন্তু আমার মা-টা যে দারুণ জেদী আর অহংকারী। এটা দিতে গেলে মা কিছুতেই নিত না। মা ভাবতো আমরা নিজেদের অসুবিধে করে স্যাক্রিফাইস করছি। দ্বিতীয় কথা, আমি যদি আর একটা রেকর্ড প্লেয়ার হাতে করে নিয়ে যাই, মা বলতো, আমি টাকা বাজে খরচ করছি, ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতো। কিন্তু তুই নিয়ে গেলে ফিরিয়ে দেবে না। তৃতীয়ত, আমাকে বোঝাতে একটা ট্রেনিং-এর জন্য যেতে হচ্ছে, দু' মাসের মধ্যে ফিরতে পারবো না। দু' মাস গ্রামে যাওয়া সম্ভব নয়। আইডিয়াটা যখন মাথায় এসেছে, তখন দু' মাস অপেক্ষা করা কি ঠিক ? তুই-ই বল !

তপনের প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত আছে। আমার সেরকম একটাও যুক্তি নেই। পট করে একটা মিথ্যে অজুহাতও মনে পড়লো না। তার ফলে আমার চোখ দুটো ফ্যালফেলে হয়ে গেল।

তপন বললো, দা সুনার দা বেটার। তুই কালকেই বেরিয়ে পড়। আমাদের গ্রামটা প্রায় পশ্চিম বাংলা আর বিহারের বর্ডারে। আমরা হাফ-বিহারী বুঝি, তোকে রুটটা বুঝিয়ে দিচ্ছি...

ছোটমামার বাড়িতে চেকটা পৌঁছে দিতে শুনলাম, ওঁরা দু'জনেই রবিশঙ্করের বাজনা শুনতে গেছেন। ফিরতে রাত হবে। বাইরে বেশ বৃষ্টি পড়ছে জমিয়ে, আমার একটু একটু খিচুড়ি খাওয়ার শখ হয়েছিল।

মামাতো ভাই পিন্টুকে সব বুঝিয়ে বলে, কয়েকটা রেকর্ড বেছে নিয়ে, রেকর্ড প্লেয়ারটি ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়লুম। ট্যাক্সি নিতে অসুবিধে নেই। তপন আমাকে পঁয়ষট্টি টাকা দিয়েছে।

হঠাৎ মনে হলো, আমি কলকাতায় কয়েকদিন থাকবো না। আমি রাজকুমারীর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। তার নামটা এখনও জানি না। কিন্তু আবার তাকে অন্তত একবার না দেখলে চলবেই না। সমস্ত নাচের আসরে ঘুরে ঘুরে ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। শুধু শুধু আমার বুক কাঁপিয়ে চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাবে ! এ কি ছেলেখেলা নাকি ?

রামপুরহাট থেকে ইব্রাহিমপুর, সেখান থেকে সাইকেল রিক্সা। রাজার বাঁধ তিন মাইলের মতন রাস্তা। একটা জিনিস তপনেরও মাথায় আসেনি। আমিও

জিজ্ঞেস করিনি। রাজার বাঁধে ইলেকট্রিসিটি আছে তো? এই রেকর্ড প্লেয়ারটা তো ব্যাটারিতে চলবে না। তা হলে এতখানি আসাটাই পণ্ডশ্রম।

রিক্সাওয়ালাসহ সঙ্গে গল্প জমাতে গিয়ে প্রথম প্রশ্নটাই গণ্ডগোল করে ফেললুম। যে-কোনো আলাপে প্রথম বাক্যটিই আসল। কোনো কারণ নেই, বেমক্কা জিজ্ঞেস করলুম, ভাই, এখানে কি খুব বৃষ্টি চলছে এখন?

লোকটি গড়গড়িয়ে উত্তর দিল, কেন, আপনার খুব বৃষ্টি দরকার নাকি? বৃষ্টির জ্বালায় অস্থির হয়ে যাচ্ছি। তার ওপরেও আপনার বৃষ্টি চাই?

লোকটির নাম দেওকীনন্দন। বাংলা বলে জলের মতন, কিন্তু বৃষ্টি পছন্দ করে না। বৃষ্টিতে ওর জীবিকার ক্ষতি হয়। কলকাতা শহরে বৃষ্টির সময় রিক্সাওয়ালাদের পোয়াবারো। কিন্তু এখানে বৃষ্টির সময় লোকে সহজে রাস্তায় বেরোয় না।

এর পরেই বিদ্যুতের কথা কী করে জিজ্ঞেস করি। যদি আবার বকুনি দেয়। আমি ভাবছিলুম, রাজার বাঁধে বিদ্যুৎ না থাকলে পত্রপাঠ এই রিক্সাতেই ফিরে যাবো। ছেলের কাছ থেকে একটা অকেজো কলের গান উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছি, এটা দেখলে কাকিমা নিশ্চয়ই খুশি হবেন না।

রিক্সাওয়ালা নিজের থেকেই জিজ্ঞেস করলো, কলকেতায় জোর বৃষ্টি হচ্ছে বুঝি?

—খুব। সকালে স্টেশানে আসতে গিয়ে ভিজে গেছি।

—আপনারাই তো বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আসেন!

—এদেশে তো জল জমে না। আমাদের কলকাতার সব রাস্তায় জল জমে যায়। বৃষ্টিতে আমাদেরই অসুবিধে বেশি হয়।

—এখানে ধান রোওয়ার সময় বৃষ্টির দেখা নেই। এখন অসময়ে দৈনিক ঝামঝমানি। আপনি রাজার বাঁধে কোন্ বাড়িতে যাবেন?

—সেন বাড়ি।

—কোন্ সেন। তিনজন আছে। কবিরাজ বাড়ি?

—না। একজন ভদ্রমহিলা একা থাকেন। কলকাতা থেকে এসেছেন।

—অ, বুঝিচি, নাড়ু গিন্নির বাড়ি।

—নাড়ু গিন্নি মানে?

—ওনার বাড়িতে অতিথি গেলেই উনি দু'খানা করে নাড়ু আর জল খেতে দ্যান। আমি দু' তিনবার সওয়ারি নিয়ে গেছি। আমাকেও দিয়েছেন। মানুষটা ভালো। কোনো দেমাক নেই।

লাল ধুলোর রাস্তা, দু' পাশে উদাত্ত মাঠ, মাঝে মাঝে জঙ্গলের মতন।

কয়েকদিনের বৃষ্টিতে মাটির রঙে একটা নয়নবিমোহন আভা এসেছে। এখানকার প্রকৃতি অনেকটা সাঁওতাল পরগনার মতন, আমার বড় প্রিয়। এই প্রথম ঠিক করলুম, এসেছি যখন, দু' তিন দিন থেকে যেতে হবে। পিওনের মতন জিনিসটা পৌঁছেই ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

তপনের কথা শুনে মনে হয়েছিল, ওর মা কোনো দূর ঐন্দো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। সে রকম কিছু তো নয়। কলকাতা থেকে ঘণ্টা চারেকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। গ্রামে যাওয়ার রাস্তাটিও বেশ চওড়া, মটোর গাড়ি যেতে পারে, বিদ্যুতের পোস্টও চোখে পড়লো। এ তো বেড়াবার মতন জায়গা।

বাড়িটার দু' ধারে বাঁশবন ও আমবাগান, অনেকখানি জমি। আমাদের রিক্সা একটা সরু নদীর ধার দিয়ে দিয়ে গিয়ে, আমবাগানের মধ্য দিয়ে ঢুকে সেই বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়ালো।

বাড়িটি পুরোনো, বাগানের পাঁচিল ভেঙে পড়েছে, একটু দূরে একটা আলাদা ঘর ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তুপের মতন ছাদহীন অবস্থায় পড়ে আছে। এই রকম পুরোনো বাড়িই আমার ভালো লাগে। রেকর্ড প্লেয়ারের ঝঙ্কাট না থাকলে, এই বাড়িতে বিদ্যুৎ না থাকাই উচিত ছিল।

পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা মানুষের মুখ বেশি মনে রাখে। আমি দু' বার ডাকতেই কাকিমা বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে অবাক হলেন ঠিকই, কিন্তু চিনতে ভুল হলো না, সঙ্গে সঙ্গে বললেন, নীলু, তুই ?

আমাকে দেখলেন প্রায় সাত-আট বছর বাদে, তার আগেও আমি তপনের বাড়িতে মাত্র দু' তিনবারই গেছি। এই সাত-আট বছরে আমার চেহারার কিছু পরিবর্তন হয়েছে আশা করি !

—কাকিমা, আমি রামপুরহাটে একটা কাজে এসেছিলুম। আসবার আগে কলকাতায় তপনের সঙ্গে দেখা হলো, ওর কাছে শুনলুম, আপনি এখানে থাকেন।

“আয়, আয়, ভেতরে আয় !”

“কাকিমা, আমি কিন্তু আজ রাত্তিরটা এখানে থাকবো।”

“শুধু আজ রাত কেন, তোরা যতদিন খুশি থাকবি।”

রিক্সা থেকে আমার বোঝা, রেকর্ড প্লেয়ারের বাক্সটা নামালুম। কাকিমা সেটা দেখে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, নিশ্চয়ই ভাবলেন ওতে আমার কিছু মালপত্র আছে। ওটার কথা পরে বললেই হবে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে শহুরে পোশাকের এক দম্পতি বসে আছে। ভদ্রলোকের বয়েস পঁয়তেরিশ ছত্রিশ হবে। মহিলাটি তিরিশের

কাছাকাছি। কাকিমা ঐদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। হাতে চায়ের কাপ। কাকিমা পরিচয় করিয়ে দিলেন, ভদ্রলোকের নাম চন্দন ব্যানার্জি, তাঁর স্ত্রীর নাম উজ্জয়িনী, স্বামীটি শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক, তাঁর স্ত্রীও ওখানকার লাইব্রেরিতে কাজ করেন। ঐরা কাকিমার প্রতিবেশী, মাসে একবার শান্তিনিকেতন থেকে এখানে চলে আসেন।

কাকিমা আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই হচ্ছে নীলু, আমার ছেলের বন্ধু। খেলাধুলো করতে খুব ভালোবাসে।

খেলোয়াড় হিসেবে যে আমার কোনো রকম সুনাম আছে, তা এই প্রথম জানলুম। ছোটবেলায় ওদের বাড়ির সামনের মাঠটায় প্রত্যেক বিকেলেই খুব ফুটবল পিটতুম তো, কাকিমার সেই কথাই মনে আছে।

আমি জানি, এখন ওদের তিনজনের মনেই কোন্ প্রশ্নটি ঘুরছে। আমার বয়েসী একজন মানুষের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না জানা যায় যে তার জীবিকা কী। বাঙালীর ছেলে চাকরিই করবে, কোন্ চাকরি, কোথায় চাকরি, সেই অনুযায়ী আমাকে মাপা হবে।

ওদের কৌতূহল নিরসন করার জন্য আমি নিজে থেকেই বললুম, আমি বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাউল গান সংগ্রহ করছি। অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে।

এটা একটা ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের ব্যাপার হলো। এটাকে ঠিক চাকরি বলা যায় না, আবার রেডিও-র গান সংগ্রাহকদের নামও প্রচার করা হয় না নিশ্চয়ই। বস্তুত, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর এরকম কোনো ব্যবস্থা আছে কি না তাই-ই বা কে জানে!

আমার কথা শুনেই চন্দন চমকে তার স্ত্রীর দিকে তাকালো।

উজ্জয়িনী ফিক করে হেসে বললো, আমিও তো এখন ঐ কাজই করছি। আপনি কতগুলো কালেক্ট করেছেন?

বিনা দ্বিধায় উত্তর দিলুম, সতেরোটা!

—অনেকগুলো কমন হয়ে যায় নি? একই গান একটু-আধটু পায়ে আলাদা আলাদা বাউলরা গায়।

—হ্যাঁ। কমন তো থাকেই।

—তারপর দেখবেন, কোনো গান নতুন বলে মনে হবে। যে গাইছে সে তার নিজের লেখা বলে দাবি করবে। কিন্তু আসলে হয়তো অনেক আগে ছাপা হয়ে গেছে। পূর্ণ দাস বাউল এরকম একটা কালেকসান ছাপিয়েছে, সেটা দেখেছেন?

—পূর্ণ দাস বাউলের বই, হ্যাঁ। দেখেছি তো বটেই, আমি নতুন যেগুলো

সংগ্রহ করি, এ কালেকশানের সঙ্গে মিলিয়ে নিই।

—আপনি কী কী পেয়েছেন, আমাকে একটু দেখাবেন? আপনি আমার সংগ্রহগুলোও দেখতে পারেন। যদি আপনার কাজে লাগে...

—আপনারটা দেখতে পেলে তো আমার অনেক উপকার হবে।

—কিন্তু সে তো এখানে নেই। শান্তিনিকেতনে আছে। অবশ্য প্রথম লাইনগুলো আমি মুখস্থ বলতে পারি।

চন্দন অস্থিরভাবে বললো, আঃ থামো তো। বাউল গানের কথা উঠলে তোমার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ভদ্রলোক সবে এসেছেন, একটু বসতে দাও!

কাকিমা বললেন, বোস নীলু, আমি তোর জন্য চা করে আনছি।

—না, কাকিমা। এফুনি চায়ের দরকার নেই। আপনি বসুন। তপনরা সবাই ভালো আছে। ওরা তো গত মাসেই এসেছিল।

অন্য কোনো একটি ঘরে রেডিও বেজে চলেছে। তপন ঠিকই বলেছিল। রেডিওতে সেতার বাজছে।

চন্দন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, জানেন, আপনাদের কাকিমা যে এখানে একা থাকেন, সেটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। এখানে আজকাল বড্ড ডাকাতি হচ্ছে, গত সপ্তাহেই একটা ডাকাতি হয়ে গেছে আমাদের বাড়িতে। বাড়িতে দু'জন লোক ছিল, একজনকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছে, আর একজনের ঘাড়ে টাঙ্গির কোপ মেরেছে, একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে।

কাকিমা বললেন, ডাকাতরা এ বাড়ি থেকে কী নেবে? কিছুই তো নেই। আমাকে ওরা বিরক্ত করতে আসবে না।

চন্দন বললো, আপনি জানেন না, কাকিমা, আজকাল কী অবস্থা। চোররাও সব ডাকাত হয়ে গেছে। ঘটি-বাটি সাইকেল এই সব নেবার জন্যও দল বেঁধে ডাকাত আসে।

কাকিমা হেসে বললেন, আসুক না। আমি কোনোদিন নিজের চোখে জলজ্যান্ত ডাকাত দেখিনি। ওরা কি গায়ে রং মেখে আসে?

—কাকিমা, আপনি কথাটা সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না! কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার একজন দারোয়ান-টারোয়ান রাখা উচিত।

—আরে বলছি তো, আমার বাড়িতে দামী কোনো জিনিস নেই। ডাকাতরাও তা জেনে গেছে। থাকার মধ্যে আছে একটা ছোট রেডিও। সেটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হিসেবে বিক্রি করলে পঞ্চাশ টাকাও পাবে না।

আমি রেকর্ড প্লেয়ারের বাক্সটির দিকে একবার তাকালুম।

কাকিমা একটা লালপাড় চেক শাঙি পরে আছেন। চোখে সোনালি ফ্রেমের

চশমা। এককালে বেশ সুন্দরী ছিলেন। এখনও সে সৌন্দর্য মুছে যায় নি। শরীরে বার্ধক্যও প্রকট নয়। আসবার পথে রিক্সাওয়ালার মুখে কাকিমার প্রশংসা শুনেছি। এরকম মানুষের কাছে ডাকাতরা কখনো আসে না। এলেও দিনের বেলা আসবে, অন্য রকম পোশাকে।

একটু বাদে চন্দন আর উজ্জয়িনী বিদায় নিল। কাল সকালে ওদের বাড়িতে আমার চায়ের নেমস্তন্ন, বিকেলে ওরা ফিরে যাবে শান্তিনিকেতনে।

কাকিমা বললেন, আয় নীলু, তোর ঘর দেখিয়ে দিই। ট্রেনজার্নি করে এসেছিস, খুব ভিড় ছিল নিশ্চয়ই? বসার জায়গা পেয়েছিলি?

—না, দারুণ ভিড় ছিল।

—তা হলে একটু শুয়ে নিতে পারিস। বিকেলবেলা নদীর ধারটা ঘুরে আয়, খুব সুন্দর। দুপুরে খেয়েছিস তো?

—হ্যাঁ খেয়েছি। এখন এককাপ চা খেতে পারি।

কাকিমা আমাকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে এলেন। সেখানে খাট-বিছানা পাতা আছে। তপনরা এলে নিশ্চয়ই এই ঘরে থাকে। একটা টেবিলের ওপর কয়েকখানা বই, পত্র-পত্রিকা আর তপনের কম্পানির একটা প্যাড।

আমার শোওয়ার দরকার নেই, দরকার একটা সিগারেট টানার। আর খান কয়েক বাউল গান এক্ষুনি লিখে ফেলতে হবে। উজ্জয়িনী সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

আধঘণ্টা কাগজ-কলম নিয়ে ধস্তাধস্তি করেও বিশেষ সুবিধে হলো না। কিছু লিখতে গেলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতন হয়ে যায়। এখনও অনেক লোক রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখে চলেছে শুনেছি। কিন্তু আমি সেরকম কিছু চালাতে গেলে উজ্জয়িনী ধরে ফেলবে, ও শান্তিনিকেতনের মেয়ে!

কী কুক্ষণে যে ঐ কথাটা বলে ফেলেছিলুম! কিংবা, ঐ সময় এ বাড়িতে চন্দন আর উজ্জয়িনীর উপস্থিত থাকার দরকার কী ছিল?

তিনটে সিগারেট পুড়িয়ে ও তপনের কম্পানির প্যাডের পাঁচটা পাতা নষ্ট করে আমি ক্ষান্ত দিলুম। কবিতা কি সকলের হাতে আসে! গণ্ডার দিয়ে কি হাল-চাষ করানো যায়? নাঃ, এ উপমাটা ভালো নয়। ভিমরুলকে দিয়ে কি গান গাওয়ানো সম্ভব? এ উপমাটাও ভালো হলো না। যাক গে, আমার দরকার কী উপমা-টুপমা নিয়ে মাথা ঘামানোর?

রেকর্ড প্লেয়ারের বাক্সটি খুলে, সব কিছু ঠিকঠাক করে একটা অতুলপ্রসাদের রেকর্ড চালিয়ে দিলুম। এবাড়িতে বিদ্যুৎ আছে, ছোটমামার মেশিনটাতেও খুঁত নেই, আওয়াজ বেশ ভালো।

কাকিমা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানাতে সরল বিস্ময়।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একগাল হেসে বললেন, এ তো বাউল গান নয়, তুই এই গানও সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিস ? আমার বাপু বাউল গান বেশি সহ্য হয় না।

—কাকিমা, আমার কাছে আরও বেশ কয়েকটা রেকর্ড আছে। দেখুন তো, এই গানগুলো আপনার পছন্দ ?

রেকর্ডগুচ্ছ হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে কাকিমা বললেন, বাঃ, এ তো সব ভালো ভালো গান রয়েছে রে ! কতদিন এই সব গান শুনিনি ! তুই এই সব নিয়ে ঘুরছিস কেন রে, নীলু ? তোর কাজের জন্য দরকার তো একটা টেপ রেকর্ডার !

—কাকিমা, এগুলো নিয়ে আমি ঘুরছি না। আপনার জন্য এনেছি।

—আমার জন্য ? তুই এগুলো আমার জন্য এনেছিস ?

—হ্যাঁ। তপন আপনাকে এই মেশিনটা পাঠিয়েছে। আমি এদিকে আসছি শুনে ও বললো আপনাকে পৌঁছে দিতে। কয়েকটা রেকর্ড এনেছি আমার ছোটমামার কাছ থেকে, এমনি পড়েছিল।

—খোকা আমাকে হঠাৎ এটা পাঠালো কেন ?

—আপনি গান শুনবেন বলে।

—গান তো আমি রেডিওতে সর্বক্ষণ শুনছি। আমার আবার এত দামী জিনিসে দরকার কী ?

—এটা এমন কিছু দামী নয়।

—রেকর্ড প্লেয়ারের কত দাম হয় আমি জানি না ? একটু আগে শুনলি না, এখানে কী রকম ডাকাতি হয় ? এই সব দেখলে ডাকাতদের লোভ পড়বে এ বাড়ির দিকে। না, না, ওটা আমার দরকার নেই। তুই ফিরিয়ে নিয়ে যাবি !

—না, না, কাকিমা, এটাতে আপনি গান শুনবেন। আপনার ভালো লাগবে।

—আমার অত গান শোনার দরকার নেই। তুই চাস এ বাড়িতে ডাকাতের হামলা হোক ?

—ডাকাতরা জানবে কী করে ? ভাববে রেডিও বাজছে।

—আজকালকার ডাকাতরা সব চেনে। তাছাড়া, তুই যে সাইকেল রিস্কয় এলি, ঐ লোকটাই বলে দেবে। ফেরার সময় তুই ঐ রিস্কোতেই যাবি, এটা সঙ্গে নিয়ে যাবি।

—কিন্তু কাকিমা, আমি তো সোজা কলকাতায় ফিরবো না, আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে। এরকম একটা ভারি জিনিস সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘোরা...

—সে আমি জানি না। তুই এনেছিস যখন, তোকেই ফেরত নিয়ে যেতে

হবে । খোকাকে বলবি, এরকম ছটহাট করে যেন কোনো জিনিসপত্র না পাঠায় । ওদের এখন বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে, অনেক খরচপত্র আছে । আমার জন্য এখন কিছু পাঠাতে হবে না । যাকগে, রেকর্ডগুলো যখন এনেছিস, শুনে নি ।

কাকিমা বসে পড়লেন মেঝেতে । মঞ্জু গুপ্তর একখানা গান শুনতে শুনতে হঠাৎ নিজেও গেয়ে উঠলেন সেই গানটা । বেশ সুন্দর গলা ! কাকিমা পিসিমাদের মুখে গান শোনার তো অভ্যেস নেই, তাই চমকে গেলাম প্রথমে । তারপরেই মনে হলো, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-সুচিত্রা মিত্রও তো এই বয়েসীই হবেন । মঞ্জু গুপ্ত বেঁচে থাকলে আমার দিদিমার সমান হতেন ।

সেই রাতে আমি একটা খুব গোলমেলে স্বপ্ন দেখলুম । তিনটে ডাকাত এসেছে, তার মধ্যে একজন হচ্ছে আমার রিক্সাওয়ালা দেওকীনন্দন, যে বৃষ্টি অপছন্দ করে । সে চোখ পাকিয়ে বললো, খুব যে কলকাতা থেকে বৃষ্টি নিয়ে এসেছো, এখন দাও, সব কিছু দাও ! কাকিমা বললেন, এই নীলু, ওদের সঙ্গে তর্ক করিস না, রেকর্ড প্লেয়ারটা দিয়ে দে শিগগির... আমি তখন ভাবতে লাগলুম, রেকর্ড প্লেয়ারটা কার গেল, তপনের না আমার ? কাকিমা ওটা ফেরত দিয়ে দিয়েছেন, তারপর ডাকাতে নিয়ে গেল... তপন বলবে, ডেলিভারি কমপ্লিট হয়নি, তুই দাম ফেরত দে ! ছোটমামা বলবেন, তুই আমার জিনিসটা নিয়ে গেলি, আর ফেরত আনলি না, এখন বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছিস... । ঘামে আমার সারা গা ভিজ়ে গেল ।

॥ ৩ ॥

—তুমি শান্তিনিকেতনে আগে কখনো আসোনি ?

—না ।

—সেকি ? এমন কোনো শিক্ষিত বাঙালী ছেলেমেয়ে থাকতে পারে, যে একবারও শান্তিনিকেতন দেখেনি ? এ তো আমি ভাবতেই পারি না !

—আমার আসা হয়নি, মানে, অনেকবারই ভেবেছি । চেনাশুনো কারুকে পেলে তার বাড়িতে থেকে ভালো করে দেখবো । কিন্তু চেনাশুনো তো কেউ ছিল না এতদিন ।

—নীলু, তুমি এখানে এক সপ্তাহ থেকে যাও । উজ্জয়িনী ভালো আলু-পোস্ত রান্না করে আর বিউলির ডাল । সঙ্গে বেগুনভাজা কিংবা পেঁয়াজের বড়া । মাছ-মাংস বিশেষ পাবে না । বড্ড দাম । তবে দু' একদিন রান্ধিরে ডিমের ঝোল পেতে পারো । খাও-দাও ঘুরে বেড়াও, আর উজ্জয়িনীর সঙ্গে বাউল গান নিয়ে

যত ইচ্ছে আলোচনা করো।

কথা বলতে বলতে চন্দনদা উঠে দাঁড়িয়ে এক সাইকেল আরোহিণী যুবতীকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। এই হাসি, হাসি, এদিকে শুনে যা!

শরীরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে যাবার ব্যাপারটা যে কী, তা এই প্রথম টের পেলুম। আমার চোখের পলক পড়তে ভুলে গেল। বুকের মধ্যে লাবডুপ লাবডুপ শব্দটাও বুঝি থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

আমার জীবনে কোনো যুক্তি নেই। কোনো কার্যকারণ নেই। কোনো নির্দিষ্ট সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা নেই। সবই যেন এক আকস্মিকতার মালা।

শেকসপীয়ার সরণির মোড়ে এক বৃষ্টি-পড়া সন্ধ্যাবেলা আমি দাঁড়িয়ে না থাকলে কিংবা দু' এক মিনিট আগে সেখান থেকে চলে গেলে চলন্ত বাসের জানলা থেকে রাহুলদা আমায় দেখতে পেতেন না। তা হলে তিনি চ্যারিটি শো-এর টিকিট গছাতে পারতেন না আমাকে। তা হলে সেই সন্ধ্যায় রাজকুমারী বেশিনী এক যুবতী নর্তকীকে দেখে আমার বুক কাঁপতো না।

সে না হয় হলো। ছোটমামার রেকর্ড প্লেয়ারটা তপনের কেনার কি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল? সে আমাকেই সেটা পৌঁছে দিতে বললো রাজার বাঁধে, সেখানে দৈবাৎ দেখা চন্দনদা ও উজ্জয়িনীর সঙ্গে। চায়ের আসরে এমন আলাপ হয়ে গেল যে ওরা আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে এলো শান্তিনিকেতনে। এর মধ্যে যে-কোনো একটা কিছু তো এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারতো।

এই ঘটনাচক্রের যে-কোনো একটা পেরেক আলাদা হয়ে গেলে রাজকুমারীর সঙ্গে আমার আর দেখা হতো না।

হাসি হাত তুলে বললো, আসছি, চন্দনদা, একটু পরেই আসছি।

সাইকেলটা একটা বাকি নিয়ে চলে গেল ডানদিকের রাস্তায়। একটা যেন গোলাপি রঙের ঘূর্ণিঝড় হঠাৎ এসে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল আমার চোখের সামনে থেকে।

রাজকুমারীকে এখানে আচমকা দেখতে পেয়ে আমার তো খুশি হবার কথা, কিন্তু আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কেন। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। ইচ্ছে করছে ছুটে পালিয়ে যেতে। একটু বাদে হাসি এখানে এলে তার সঙ্গে আমি কী কথা বলবো? আমি কে, কেউ না!

সে আসবার আগেই কেটে পড়লে হয়। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, চন্দনদা, আমি একটু শ্রীনিকেতনের দিক থেকে ঘুরে আসি!

ডান হাতের তর্জনী নাচিয়ে চন্দনদা বললেন, বসো, বসো। উজ্জয়িনী আসুক আগে। তুমি একলা একলা কী যাবে। কিছুই দেখতে পাবে না। একজন

কারুকে সঙ্গে দেবো, তখন যেও !

—আমার একলা একলা ঘুরতেই বেশি ভালো লাগে ।

—ঘুরবে । একলা একলা ঘোরার অনেক সময় পাবে । আচ্ছা বলো তো নীলু, গুরুদেবের শেষ দশ বৎসরের লেখা তোমার কেমন লাগে ?

—গুরুদেব কে ?

—তুমি জানো না গুরুদেব কে ? তুমি কি বাঙালীর ছেলে ? শান্তিনিকেতনে গুরুদেব বলতে একজনকেই বোঝায় ।

—রবীন্দ্রনাথ যখন মারা যান, তখন আপনার জন্মই হয়নি । তা হলে উনি কী করে আপনার গুরুদেব হলেন ?

—ওসব কথা বাদ দাও ! ঐ কবিতাগুলো কেমন লাগে তাই বলো ।

—আমি গুরুদেবের কোনো লেখাই পড়িনি । রবীন্দ্রনাথের সব লেখাই আমার ভালো লাগে । মানে যতটা বুঝতে পারি, সব তো আর বুঝি না !

—শেষের দিকে, তোমার মনে হয় না, কবির ওপর দার্শনিক সত্তা বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে !

—ওসব শব্দ শব্দ প্রশ্ন আমায় কেন জিজ্ঞেস করছেন, চন্দনদা ?

—এই বিষয়ে আমি একটা পেপার লিখেছি, বুঝলে, বেশি বড় নয় । পঞ্চাশ-ষাট পাতা হবে । সেটা শুনলে সব ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে ।

আমি একটা টোক গিলে বললুম, হ্যাঁ, শুনবো । মানে, সঙ্কের পর বেশ নিরিবিলিতে ।

চন্দনদা মুখ কুঁচকে বললেন, সঙ্কের পর প্রায় প্রত্যেকদিন লোড শেডিং । লেখা-পড়া করার কি উপায় আছে ? দাঁড়াও, খাতাটা নিয়ে আসছি !

পূর্বপল্লীর একপ্রান্তে এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছে চন্দনদা । বেশ বড় বাড়ি, সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা । এক সময় সেখানে একটা বাগান করার চেষ্টা হয়েছিল । তার সামান্য চিহ্ন এখনো রয়ে গেছে । রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝেই যাচ্ছে সাইকেল । দুপুর থেকেই ঝেঁকে ঝেঁকে আসছে বৃষ্টি, খুব প্রবল নয় । হালকা হালকা । যেন বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সোজা নামছে না । উড়তে উড়তে আসছে ।

কাকিমার কাছে অতি কষ্টে রেকর্ড প্লেয়ারটা রেখে আসা গেছে । পরে কোনো এক সময় আমি ফেরত নিয়ে যাবো, এই কড়ারে । সকালবেলা চন্দন-উজ্জয়িনীর বাড়িতে গিয়ে এমন ভাব জমে গেল যে ওদের সঙ্গেই আসতে হলো শান্তিনিকেতনে । চন্দন হয়ে গেল চন্দনদা আর উজ্জয়িনীর সঙ্গে তুমি-তুমি সম্পর্ক ।

চন্দনদার মধ্যে একটা পিঠ চাপড়ানির ভাব আছে। উনি ধরেই নিয়েছেন আমি একটি পথভ্রষ্ট ছোকরা। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। ঠিক লাইনে পড়াশুনা করিনি। এই ধরনের উটকো ছেলেদের উপদেশ দিয়ে, নিজের জীবন দর্শন দিয়ে অনুপ্রাণিত করে উনি ঠিক পথে চালাতে চান। চন্দনদা আমার ট্রেনের টিকিট কেটেছেন জোর করে, কিন্তু তারপর থেকে উনি আমাকে অনবরত জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন। উজ্জয়িনী অবশ্য থামাবার চেষ্টা করছে মাঝে মাঝে।

রাজকুমারীর ডাকনাম তা হলে হাসি। ভালো নাম নিশ্চয়ই রাজকুমারী নয়। সে কি এখানকার ছাত্রী, না এখানকার কাকুর আত্মীয়া? তাই সাইকেল চালানোর মধ্যে এমন একটা সাবলীলতা আছে যে মনে হয়, সে এখানে অনেক দিন আছে। কলকাতার মেয়েরা এমন সাইকেল চালাতে পারে না। রাজকুমারীকে এখানেই মানায়।

চন্দনদা হাতে একটা মোটা ফাইল নিয়ে ফিরে এলো। মুখে জ্বলন্ত চুরুট। আমি লক্ষ্য করেছি, অনেকেরই চুরুট টানতে গেলে ভুরু দুটো উঁচু হয়ে যায়, তাতে আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব আসে।

তা হলে এই বৃষ্টির বিকেলে আমাকে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ শুনতে হবে? এখন হঠাৎ দাঁত-মুখ খিচিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে কেমন হয়? পরে বলবো, আমার মৃগীরোগ আছে!

এই সময়ে একটা সাইকেল রিক্সা থামলো গেটের সামনে। উজ্জয়িনী ফিরে এসেছে। যাক বাঁচা গেল।

লাল টুকটুকে শাড়ি পরা উজ্জয়িনী ঝলমলে হাসি দিয়ে বললো, নীলু, কাত্যায়নদাকে এইমাত্র তোমার কথা বললুম। উনি তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। তোমার সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড।

চাণক্য নাটকের বাইরে আমি কাত্যায়ন নামটি এই প্রথম শুনলুম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সে আবার কে? তার বদলে বললুম, ও তাই নাকি?

কাত্যায়নদা রেডিওতে দু'বার বাউল গান বিষয়ে টক দিয়েছেন। বাউলদের সম্পর্কে অথরিটি।

—ওঁর বাড়িটা কোথায়! তা হলে যাই, ঘুরে আসি!

চন্দনদা বললেন, না, না, এখন না! উনি রাস্ত্রির সাড়ে আটটার আগে কাকুর সঙ্গে বাড়িতে দেখা করেন না। আটটার সময় ডিনার খেয়ে নেন তো।

উজ্জয়িনী বললো, হ্যাঁ, সাড়ে আটটার পরই যেও, আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

তারপর চন্দনদার দিকে সকৌতুকে বললো, আমি ছিলুম না, এই ফাঁকে তুমি তোমার ঐ অখাদ্য প্রবন্ধটা বুঝি নীললোহিতকে শুনিয়ে দিয়েছো ?

চুরুটের ছাই ঝেড়ে গভীরভাবে চন্দনদা বললেন, তুমি সহজিয়া তত্ত্ব নিয়ে মেতে আছো, তাই এসব গভীর ব্যাপার তোমার মাথায় ঢোকে না। সব জিনিস সকলের খাদ্য নয় !

ভৎসনাটুকু একদম গায়ে না মেখে উজ্জয়িনী বললো, জানো, আজ রাজাকে দেখলুম। রতনকুঠির দিকে গেল। ও এখন প্রত্যেক উইক এণ্ডে আসতে শুরু করেছে। আর তর সহিছে না !

চন্দনদা 'তাই নাকি' বলে হা হা করে হাসতে শুরু করলেন। উজ্জয়িনীরও হেসে গড়াগড়ি যাবার মতন অবস্থা।

এটা ওদের প্রাইভেট জোক, এর মধ্যে আমার মাথা গলানোর কোনো মানে হয় না। আমি আকাশ দেখতে লাগলুম। এক ঝাঁক বক দিনের শেষে কুলায় ফিরছে। অন্ধকার হয়ে এলো প্রায়।

উজ্জয়িনী হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা চা খেয়েছো ?

চন্দনদা বললেন, না, মানে, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম।

—তুমি নীললোহিত বেচারাকে এককাপ চা-ও খাওয়াও নি ? ছি ছি ছি ছি। আমি এফুনি চা করে আনছি !

—শোনো, বিস্কুট কেনা হয় নি। চায়ের সঙ্গে, যদি একটু নিমকি-টিমকি ভেজে দিতে পারো...

উজ্জয়িনী রান্নাঘরে চলে যেতেই আলোটা জ্বলে দিলেন। তারপর আমার দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে এবারে শুরু করা যাক ?

আমি সামান্য ঘাড় হেলিয়ে মিন মিন করে বললুম, হ্যাঁ। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে...

চন্দনদা ফাইলটা খুলে একবার গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর সবেমাত্র পড়তে শুরু করলেন, জীবন জিজ্ঞাসা যখন জীবন দেবতার কাছে এসে পৌঁছোয়, পথের অনুসন্ধান যখন হৃদয়ের আবিষ্কারে পরিণত হয়...তার পরেই আলো নিভে গেল। শুধু এ বাড়িতে নয়, গোটা শান্তিনিকেতন অন্ধকার।

স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে অনেক ধন্যবাদ। ওঁরা জানেন, ঠিক ঠিক কখন লোড শেডিং করতে হয়। আমার মতন আরও কত মানুষের উপকার করবার জন্য কোথায়, কোন সময় লোড শেডিং করতে হবে। সেই হিসেব রাখতেই ওঁরা হিমসিম খেয়ে যান।

চন্দনদা বললেন, যাচ্ছেতাই ! এই জন্য মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বলকাতায়

চলে যাই ।

—কলকাতায় সন্কেবেলা অন্ধকারে বসে গরমে ঘামতে হয় । এখানে তো তবু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে । আপনার লেখার বিগিনিংটা কিন্তু দারুণ চন্দনদা ! জীবন জিজ্ঞাসা থেকে জীবন দেবতা...অপূর্ব ! জীবন দেবতা কথাটা অন্তত এক হাজার বার পড়েছি আর শুনেছি, কিন্তু আপনার মতন এমন ঠিক ঠিক ভাবে আগে কেউ ব্যবহার করতে পারেনি ।

—আর একটু শুনলে বুঝতে পারতে, গুরুদেবের কবিতার একটা নতুন ইন্টারপ্রিটেশান...

গেট ঠেলে একটা সাইকেল ঢুকলো চত্বরে । একটি সুরেলা গলা চুঁচিয়ে বললো, চন্দনদা, বাড়িতে আছেন তো !

চন্দনদা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো, হাসি । উজ্জয়িনী, এক কাপ চা বেশি করে... হাসির সাইকেল এসে বারান্দার সামনে থামতেই আমি উঠে পড়ে বললুম, একটু আসছি !

অন্ধকারে হাসি আমাকে দেখতে পাবে না । কিন্তু প্রথমেই আমি তার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই না । চন্দনদা আমার কী পরিচয় দেবে ?

ভেতরে এসে দেখলুম, উজ্জয়িনী রান্নাঘরে একটা মোম জ্বলে চা ছাঁকছে । আমাকে দেখেই সে বললো, বাথরুমে যাবে ? নাও, এই মোমটা নাও ! বাড়িতে আর মোম নেই ।

—না, বাথরুমে যাবো না । তোমার কোনো সাহায্যের দরকার কি না দেখতে এলুম ।

—বাবা, তুমি তো দেখছি খুব কাজের ছেলে । আমার কিছু সাহায্য লাগবে না । তুমি গিয়ে বাইরে বসো না, আমি এক্ষুনি চা নিয়ে যাচ্ছি ।

—চার কাপ চা তুমি একলা নিয়ে যাবে কী করে ?

—এই তো ট্রে রয়েছে । হাসি এসেছে, তাই না । ওর সঙ্গে আলাপ করলে তোমার ভালো লাগবে । খুব মজার মেয়েটা ।

—শান্তিনিকেতনে পড়ে বুঝি ?

—না, ওরা আগে ছিল এলাহাবাদে । সেখানেই পড়াশুনো করেছে । ওর বাবা এই কিছুদিন হলো সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে এসেছেন । হাসি এখন সঙ্গীত ভবনে গান শিখছে ।

উজ্জয়িনী চায়ের ট্রে-টা নিল, আমি পঁয়াজির প্লেট দু'খানা হাতে নিয়ে চললুম ওর পেছন পেছন ।

হাসি এখনো বসেনি, সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । অন্ধকারের মধ্যে

যেন এক ফালি জ্যোৎস্না। আমি কখনো এত দুর্বল বোধ করিনি কোনো মেয়ের সামনে। আমার ভয় করছে, খুব ইচ্ছে করছে পালিয়ে যেতে। হাসির সঙ্গে যেন আমার আলাপ না হয়! আলাপ হলেই যদি ও সাধারণ হয়ে যায়?

আমার বুক কেঁপেছিল মঞ্চের ওপর এক রাজকুমারীকে দেখে। সঙ্গীত ভবনের কোনো ছাত্রীর জন্য নয়।

হাসি বললো, চিনিদি, আমার খুব খিদে পেয়েছে। শুধু চা খাবো না, আর কী আছে দাও।

—ঐ তো পেঁয়াজি রয়েছে, খা না!

হাসি ঝুঁকে এসে আমার হাতের প্লেট থেকে দু' তিনটে পেঁয়াজি একসঙ্গে তুলে উঃ বড্ড গরম বলে লাফাতে লাগলো, তার সাইকেলটা পড়ে গেল বন বনাৎ করে।

উজ্জয়িনী বললো, বেশ হয়েছে। সাইকেলটা রেখে ভালো করে বসতে পারিস না? সব সময় পায়ে চর্কি বেঁধে ঘুরবি!

হাসি সাইকেলটা তুলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলো। তারপর আড় চোখে তাকালো আমার দিকে। যেন এই ক্ষুদ্র দুর্ঘটনার জন্য আমিই দায়ী।

উজ্জয়িনী বললো, এই হচ্ছে নীললোহিত, আমাদের নতুন বন্ধু। আয় হাসি, এই চেয়ারটায় বোস। তোকে এক্ষুনি একটা ভালো খবর দেবো।

হাসি বললো, জানি! টি ভি প্রোগ্রাম তো?

—কিসের টিভি প্রোগ্রাম? সেটা তো আমি শুনিনি।

—দিল্লির টিভি থেকে 'শ্যামা' করবে, তাতে আমাকে নিতে চায়। আমি অবশ্য এখনও হ্যাঁ কিংবা না কিছু বলিনি। ক'দিন ভেবে দেখি। আচ্ছা, চিনিদি, তুমি বলো তো? আমার কি নেওয়া উচিত?

চন্দনদা বললো, হ্যাঁ, কেন নেবে না। দিল্লি থেকে করছে? এ তো দারুণ অফার! তোর চেনা কেউ আছে বুঝি দিল্লি টি ভি-তে?

—ভ্যাট, চেনা কে থাকবে? ওরা নতুন মুখ খুঁজছে। শান্তিনিকেতনে এসেছিল...মোহরদির কাছে...

—তোকে কোন্ রোলটা দিতে চাইছে?

—শ্যামা

—মেইন রোল। এ রকম চান্স ছাড়ার তো কোনো কোশেনই ওঠে না।

—শ্যামা আমাকে মানাবে? আমার ইচ্ছে করছে না।

—তোকে এমন ভাবে সাজিয়ে দেবে দেখবি...

এমন টি ভি-র আলোচনায় ওরা মগ্ন হয়ে গেল, আমি যে একটা বাইরের

মানুষ উপস্থিত রয়েছি তা ওরা ভুলেই গেল। আমি চুপচাপ চা খেতে লাগলুম। হাসি আমার মতামত চাইলে আমি বলতুম, শ্যামার ভূমিকায় তাকে মানাবে না। ঐ টি ভি প্রোগ্রামটা হাসির নেওয়া ঠিক হবে না।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামলো।

টি ভি-র কথা থামিয়ে হাসি বললো, এই রে, এখন আমি ফিরবো কী করে?

উজ্জয়িনী বললো, কেন, তোর এত যাওয়ার তাড়া কিসের রে?

চন্দনদা বললো, নিশ্চয়ই রতনকুঠিতে একবার খোঁজ নিতে যাবে। এই হাসি, সন্দের পর তোর রতনকুঠিতে না যাওয়াই ভালো।

—রতনকুঠিতে? সেখানে আমি কেন যাবো?

—আহা-হা, আমাদের কাছে আর লুকোতে হবে না।

উজ্জয়িনী বললো, না, ও লুকোচ্ছে না। ও জানে না। শোন হাসি, তোর রতন-কুঠি একটু বাদেই এখানে আসবে।

হাসি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি বাড়ি যাবো, আটটা পনেরোর সময় একটা রেডিও প্রোগ্রাম শুনবো।

—তার অনেক দেরি আছে। তুই আমাদের একটা গান শুনিয়ে যা।

—চিনিদি, রোজ-রোজ লোডশেডিং হচ্ছে আর অঙ্ককারের গান গেয়ে গেয়ে সব রবীন্দ্রসঙ্গীত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

চন্দনদা বললো, অঙ্ককারের গান শুনতেও চাই না। ‘ও আমার আঁধার ভালো’, এই গানটা শুনলেই এখন আমার রাগে গা জ্বলে যায়।

উজ্জয়িনী বললো, রবীন্দ্রনাথ ইলেকট্রিসিটির বন্দনা করে কোনো গান লেখেননি, সে রকম গান থাকলে লোডশেডিং হলেই আমরা সেই গানটা কোরাস গেয়ে প্রার্থনা জানাতুম।

চন্দনদা বললো, অঙ্ককারের মধ্যে আরও কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে। হাসি তুই একটা মন-ভালো করার গান শুনিয়ে যা। নীলু, তোমার কোন বিশেষ পছন্দের গান আছে?

আমি বললুম, হ্যাঁ। এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি—এটা অনেক দিন শোনা হয়নি।

সঙ্গে-সঙ্গে আলো জ্বলে উঠলো। প্রথমটা চোখ ঝাঁপিয়ে যায়।

এই প্রথম হাসি আমাকে দেখলো। কয়েক পলক, স্থিরভাবে। তারপর, লাজুক, বিনীত গলায় বললো, ঐ গানটা আমি ভালো জানি না। আমি তো বেশি গান শিখিনি।

রাজকুমারীর সজ্জার বদলে একটা সাধারণ গোলাপী শাড়িতেও হাসিকে বেশ

মানিয়েছে। তার লম্বা শরীরটিতে একটা তরঙ্গ আছে। সে বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না! চোখদুটি যেন উড়ে যেতে চাইছে।

শান্তিনিকেতনে সুশ্রী মেয়ে অনেক আছে, হাসিকে তাদের তুলনায় অসাধারণ কিছু বলা যায় না। তবে তার অবাক-অবাক চোখ দুটির মধ্যে রয়েছে আমাদের ভুলে যাওয়া সারল্য।

আমি হাসির দিকে বোধহয় একটু বেশি সময়ই চেয়ে আছি, কোনো কথা বলছি না, এটা নিশ্চয়ই খারাপ দেখাচ্ছে। চোখ সরিয়ে নিলুম।

হাসি আবার বললো, আজ আলো এসে গেছে, আজ আমি যাই। আর একদিন এসে গান শোনাবো।

উজ্জয়িনী বললো, ও কবে চলে যাবে তার ঠিক নেই।

—আপনি এখানে থাকেন না বুঝি?

আমি নিঃশব্দে দু'দিকে মাথা নাড়লুম। চন্দনদা বললো, এই ছেলেটা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। দারুণ সব ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটে এর জীবনে। রিসেন্টলি একটা গ্রামে চোর হিসেবে ধরা পড়েছিল। এই নীলু, সেইটা বলা না হাসিকে!

সত্যি ঘটনা বারবার বলা যায়। কিন্তু বানানো গল্প ছবছ একভাবে দ্বিতীয়বার বর্ণনা করা মুশকিল। ট্রেনে আসবার সময় উজ্জয়িনী-চন্দনদাকে আনন্দ দেবার জন্য আমি ঠিক কী বলেছিলুম মনে নেই।

আমি হাসিকে বললুম, ওটা একটা বানানো গল্প। আপনি ভালো নাচতে পারেন, তাই না?

—আপনি কী করে জানলেন?

—আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়!

—মোটাই তা নয়। নিশ্চয়ই কারুর কাছে শুনেছেন। আমি গানের চেয়ে নাচতেই বেশি ভালোবাসি।

চন্দনদা বললো, এখন এই বারান্দায় তো তোকে নাচ দেখাতে বলতে পারি না, সেইজন্যই একটা গান শোনাতে বলেছিলুম।

—বাইরে বৃষ্টির মধ্যে নাচবো?

উজ্জয়িনী বললো, এই হাসি, পাগলামি করিস না।

হাসি তার চোখ, নাক, ঠোঁট, কান, কপাল, চিবুক, এমন কি চুলে পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে বললো, আমার এক-একসময় কী ইচ্ছে করে জানো, চিনিদি? কলকাতায় যখন যাই, তখন একদিন বাস থেকে নেমে পড়ে, চৌরঙ্গির মাঝখানে, সব বাস আর গাড়ি-টাড়ি থামিয়ে, সেইখানে সবাইকে নাচ দেখাই। আমার সঙ্গে একজন

তবলটি থাকবে, সে-ও রাস্তার ওপর বসে পড়বে...এ রকম করা যায় না ?

চন্দনদা-উজ্জয়িনী একসঙ্গে হাসতে লাগলো । চন্দনদা উঠে এসে হাসির মাথায় একটা চাপড় দিয়ে বললো, এই মেয়েটা দেখছি সত্যি পাগল ! তোর এই প্রশ্নাবটা রাজাকে দিয়ে দেখিস তো । শুনবো, সে কি বলে ?

উজ্জয়িনী বললো, রাজা এখনো এলো না কেন ? বৃষ্টিতে বোধহয় আটকে গেছে ।

হাসি চমকে গিয়ে বললো, রাজা কোথায় ?

—রতনকুঠিতে. এসে উঠেছে । তুই জানিস না ?

—না তো ! কখন এলো ? তা হলে যাই, রাজাকে ডেকে আনি... তখুনি গেটের বাইরে ডাক শোনা গেল, চন্দনদা ! চন্দনদা !

চন্দনদা বললো, ঐ তো হীরো হাজির হয়ে গেছে । এসো, ভেতরে চলে এসো !

সবাই গেটের দিকে ফিরলো । আমি হাসিকে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি যে চৌরঙ্গির মাঝখানে নাচবার কথা ভেবেছেন, কোন্ পোশাকে নাচবেন, রাজকুমারী না ভিখারিণী সেজে ?

—এই যেমন পোশাকে এখন আছি ।

হাসি গেটের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক, তাই আমার প্রশ্নটা তার মনে ঠিক রেজিস্টার করলো না ।

আমি বললুম, আইডিয়াটা কিন্তু আমার চমৎকার লাগছে ।

হাসি আমার এ-কথাটা বোধহয় শুনতেই পেল না । চৈচিয়ে বললো, এই,তুমি কখন এসেছো ? এসেই আমায় খবর দাওনি কেন ?

দৌড়ে এসে একজন যুবক বারান্দায় উঠলো । রুমাল দিয়ে মুখের জল মুছতে-মুছতে বললো, খবর দেবো কী ! যেমন অন্ধকার, তেমন বৃষ্টি ! এখানে তোমরা থাকো কী করে ?

উজ্জয়িনী একটা তোয়ালে এনে বললো, ভালো করে মাথাটা মুছে নে । এই বৃষ্টি ভিজলেই নির্যাত জ্বর ।

হাসি তোয়ালেটা ঝেড়ে নিয়ে বললো, না, মুছতে হবে না । চলো, বৃষ্টি ভিজতে-ভিজতে আমরা খোয়াই-এর ধারে যাই । চলো, চলো, এক্ষুনি চলো ।

রাজা নামের যুবকটির বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, মনে হয় নিয়মিত ব্যায়াম করে কিংবা টেনিস খেলে । প্যান্টের ওপর চৌখুঙ্গি কাটা হাওয়াই শার্ট পরা, মাথায় অনেক চুল । জুলপি দুটো লম্বা ।

সে তার চোখ দুটি গোল করে বললো, এই বৃষ্টির মধ্যে খোয়াই-এর ধারে

যাবো, কেন ?

হাসি বললো, কেন আবার কী, এমনি ! যেতে ইচ্ছে করছে আমার ।

চন্দনদা বললো, এই বৃষ্টির মধ্যে কেউ খোয়াই যায় ? অন্ধকার হয়ে গেছে, কিছু দেখা যাবে না । হাসি তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বৃষ্টির মধ্যে খোয়াই যাওয়ার কোনো নিষেধ আছে নাকি ? টর্চ নিয়ে যাবো ।

রাজা এবারে তার চোখ দুটি স্বাভাবিক করে, হাসির কথা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বললো, ভ্যাট ! খোয়াই-ফোয়াই বাদ দাও তো, এখানে জমিয়ে আড্ডা দিতে এসেছি ।

হাসি তবু অনুনয় করে বললো, আমরা সবাই মিলে যাবো তো বলছি, ওখানে আড্ডা দেবো ! চলো না, তোমরা চলো না !

উজ্জয়িনী বললো, আমাদের অত শখ নেই ভাই । তোদেরও এখন বৃষ্টি ভেজা মোটেই উচিত নয় । আর তো মোটে কুড়ি-বাইশ দিন বাকি !

হাসি বললো, বাইশ দিন না, পঁচিশ দিন । সে তো অনেক দেরি ।

চন্দনদা হো-হো করে হেসে উঠে বললো, আর বুঝি ধৈর্য রাখতে পারছিস না ! প্রত্যেকটা দিন গুনছিস । আর রাজা, তুই প্রত্যেক উইক এন্ডে ছুটে আসছিস, তোর লজ্জা করে না ?

উজ্জয়িনী বললো, আমরাও ভাই প্রেম করে বিয়ে করেছি । কিন্তু তোদের মতন এমন আদেখলেপনা আমাদের ছিল না ।

রাজা বললো, বাঃ, বিয়ের আগে কোর্টশিপ চলবে না ? সেটা বাদ যাবে কেন ?

তারপর রাজা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ইনি কে ? ঐকে তো চিনলাম না । একেবারে চুপচাপ বসে আছেন !

॥ ৪ ॥

রাজতন্ত্রের আমি সব কিছু অপছন্দ করি, রাজা-রানী, মন্ত্রী, রাজার কাকা, রাজার শালা, সেনাপতি ইত্যাদি । তবে আমার বরাবরই ধারণা, রাজকুমারীদের থেকে যাওয়া উচিত ছিল । কয়েকটি রাজপুত্রও অ্যালাউ করা যেতে পারে । রাজকুমারী, রাজকুমার, কিন্তু তারা কোনোদিন রাজা-রানী হতে পারবে না, তারা শুধু নতুন-নতুন রূপকথা তৈরি করে যাবে ।

মঞ্চের ওপর রাজকুমারীবেশিনী যে নর্তকীকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম, দৈবের কী লীলা, তারই ভাবী স্বামীর নাম রাজা !

হাসির ভালো নাম অবশ্য অনিন্দিতা । সে মোটামুটি ভালো গান করে, নাচে, সবচেয়ে বড় কথা, বর্ষাকালের ঝন্টার মতন তার খুশির চাঞ্চল্য যেন সব সময় উপছে পড়ছে । এরকম একটি মেয়ের সঙ্গে সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান এবং একটা টায়ার কোম্পানির উন্নয়নশীল অফিসার রাজা সরকারের বিয়ে হবে, এ তো অতিস্বাভাবিক ও আনন্দজনক ঘটনা ।

আমার দুঃখ পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আমি প্রতিযোগিতায় নামার কোনো সুযোগই পাইনি । শান্তিনিকেতনে এসে যদিবা অকস্মাৎ আমার কয়েকদিনের ধ্যান-সুন্দরীকে রক্ত-মাংসের শরীরে দেখলাম, কিন্তু তারপর এত তাড়াতাড়ি রাজা এসে পড়লো যে হাসির সঙ্গে আমার আলাপই হলো না ভালো করে । জীবন এরকম অদ্ভুত । এ যদি গল্প হতো, তা হলে পাকা লেখকের বর্ণনায় হাসি ওরফে অনামিকা মজুমদারের সঙ্গে বাউলগান সংগ্রাহক, বাউণ্ডলে নীললোহিতের অন্তত দু'তিনদিনের আলাপ, ঘনিষ্ঠতা, প্রেম, তারপর বিচ্ছেদের মুহূর্ত, দু'জনে দু'জনের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে বিদায়...বেশ একটা রস-ঘন ব্যাপার তৈরি হয়ে যেত ।

কিন্তু এ যে সূচনা হতে না হতেই শেষ ! রাজা অন্তত একটা উইক এন্ড বাদ দিলে পারতো না ? হাসি যে বাগদত্তা একথা জানতে পারলে নিশ্চয়ই আমি বেশি দূর এগোতুম না, কিন্তু তবু তো মনে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব নিয়ে কাটানো যেত । সেসব কিছুই না, মাঝখান থেকে আমাকে মাথার চুল ছিঁড়ে গোটা পাঁচেক দু'তিন লাইনের বাউল গান লিখতেই হলো উজ্জয়িনীর জন্য, আর ওর খাতা থেকে আমায় টুকতে হলো অত্যন্ত অনাবশ্যক চোদ্দখানা বাজে গান ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা চন্দনা-উজ্জয়িনী-রাজা-হাসির আড্ডায় সামান্য কিছুক্ষণ বসে থেকে আমি ভেতরে চলে গিয়েছিলুম প্রচণ্ড মাথা ধরার অধিলায় । কাত্যায়ন না মধুকৈটভ কী যেন সেই বাউল-বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোকের নাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করার কোনো প্রশ্নই ছিল না । পরের দিন সকালেও রাজা আর হাসির সঙ্গে একবার ঘন্টাখানেকের জন্য দেখা হয়েছিল বটে, কিন্তু আমি কেটে পড়েছি দুপুরের ট্রেনে ।

রাজার কাছাকাছি দাঁড়ালেই আমাকে মিটমিটে দেখাচ্ছিল । সে সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান যুবক, তার পাশে আমি যেন কাটা সৈনিক । তার সঙ্গে যে-কোনো প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম রাউণ্ডেই কুপোকাং হতে বাধ্য । আমার সবচেয়ে বড় অযোগ্যতা, আমার কোনো ভদ্রগোছের জীবিকা নেই, আমার বাবাও বড় সরকারী অফিসার ছিলেন না । যাক গে যাক, ওসব কথা আর ভেবে লাভ নেই । মাঝখান থেকে হলো কী, শান্তিনিকেতনের ওপরেই আমার রাগ ধরে গেল । আমার পক্ষে

বড় অপয়া জায়গা। একে তো এই সব ব্যাপার, তার ওপর আবার চন্দনদার সেই প্রবন্ধ শুনতেই হয়েছে।

আমি চেষ্টা করেও দুপুরের ট্রেনে বসে শান্তিনিকেতনের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলুম না।

সকালে, সবাই মিলে হাঁটতে যাওয়া হয়েছিল রিজার্ভ ফরেস্টের দিকে। ওখানে নাকি হরিণ আছে, ময়ূর আছে। কিছুই দেখা যায়নি অবশ্য। ফরেস্ট বাংলাটিতে কোন্ এক মন্ত্রী এসে রয়েছেন, সুতরাং সেই বাংলার হাতায় বসে চা খাওয়ার বাসনাটিও জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। তবে, একটা জামরুল গাছের ডালে একটা ময়ূরের পালক আটকে ছিল, হাসি সেটা দেখে ছেলেমানুষের মতন আবদার করে বলেছিল, আমাকে ঐ পালকটা পেড়ে দাও না!

রাজা কয়েকটা টিল ছুঁড়ে সেই পালকটা পাড়বার চেষ্টা করেছিল। চন্দনদা গাছটা ধরে ঝাঁকবার বৃথা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই পালক অতি অবাধ্য। তখন রাজা বলেছিল, বোলপুরের দোকানে ময়ূরের পালক বিক্রি হয় আমি দেখেছি, তোমাকে একগোছা কিনে দেবো এখন! তুমি এখনও পুতুল খেলো বুঝি?

কিন্তু যে-মেয়ে জঙ্গলে গাছের ডালে আটকানো কোনো উড়ন্ত ময়ূরের খসে-পড়া পালক দেখে মুগ্ধ হয়েছে, সে কেন দোকানের জিনিসে প্রবোধ মানবে?

হাসি একবার মাত্র আমার দিকে তাকিয়ে, তারপর নিজেই চড়বার চেষ্টা করেছিল ঐ গাছটায়। উজ্জয়িনী আর রাজা দু'দিক থেকে তার হাত চেপে নামিয়ে আনলো। আর কিছুদিনের মধ্যেই শুভকাজ, এখন হাসির পড়ে-টড়ে গিয়ে পা মচকালে সেটা খুবই অমঙ্গলের ব্যাপার হবে।

সেই সময়ে আমি একবার একটুখানি দুর্বল হয়েছিলুম। আমি ছেলেবেলায় অনেকবার খেজুর গাছে উঠে রস চুরি করে খেয়েছি। একটা জামরুল গাছে ওঠা তো আমার পক্ষে ছেলেখেলা। ঐ ময়ূরের পালক আমি পেড়ে দিতে পারতুম নিশ্চিত। অন্তত না পারলেও গাছটায় ওঠার চেষ্টা তো করতে পারতুম ঠিকই।

কিন্তু একটি যুবতী তার প্রেমিক তথা হবু স্বামীর কাছে একটা শখের জিনিসের জন্য অনুরোধ করেছে, সেখানে আমার মতন বাইরের একটা উটকো লোকের মাথা গলানো যে চূড়ান্ত ক্যাবলামি, সেটুকু অন্তত বোঝার মতন কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে। সেই মুহূর্তে আমি ঠিক করেছিলুম, পরবর্তী ট্রেনেই সটকে পড়বো শান্তিনিকেতন থেকে।

ময়ূরের পালক চাওয়াটা অবশ্য এমন কিছুই নয়, অন্য অনেক মেয়েই চাইতো। তবে, অন্ধকারে, বৃষ্টির মধ্যে খোয়াই দেখতে যাওয়ার কথা খুব বেশি

মেয়ে বলবে কি ? আর কিছু না হোক, সাপের ভয় পাবে না ?

আর ঐ দিনের বেলা চৌরঙ্গিতে সব গাড়ি থামিয়ে নাচের আইডিয়াটা ? অন্য কোনো মেয়ের মুখে আমি এ ধরনের কথা শুনি নি। অন্তত কোনো শান্তিনিকেতনের মেয়ের কাছে এই কথা আশাই করা যায় না। রাজা অবশ্য এই কথা শুনে বলেছিল, খবরদার, তুমি যেন আমার বাবা-মার সামনে এরকম কথা কক্ষনো ভুলেও উচ্চারণ করো না, ওঁরা যা শকড় হবেন !

হাসি অর্থাৎ অনিন্দিতা তার চেহারা বা রূপে এমন কিছু অনন্যা নয়, কিন্তু ঐ তিনটি কথার জন্য তাকে আমার বেশি ভালো লেগেছিল। অঙ্ককারে, বৃষ্টির মধ্যে খোয়াইয়ের ধারে যাবার প্রস্তাব শুনেই আমার মন নেচে উঠেছিল। হাসি চৌরঙ্গির মাঝখানে সত্যি কোনোদিন নাচলে আমি গাদাখানেক ভদ্র, গম্ভীর, নাক-উঁচু বাবা-মায়েদের জোর করে ধরে এনে বলতুম, দ্যাখো, দ্যাখো, হাততালি দাও, তোমরাও নাচো !

কিন্তু এসব আমার যোগ্যতা নয়, আমি রাজার তুলনায় নিজেকে বড় করে দেখাবার, মানে রোমান্টিক হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করছি ! কেন ? কার কাছে ?

বসবার জায়গা পাইনি, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দুলতে-দুলতে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, হঠাৎ পিঠে একটা চাপড় ! তারপরেই মধুর সম্ভাষণ, কী রে হারামজাদা !

একগাল হাসি-মুখে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে জয়দেব। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় জয়দেবের প্লুরিসি হয়েছিল। তার আগে ওর চেহারা ছিল প্যাংলা মতন, চোখ দুটোও ছোট-ছোট, নিভু-নিভু। প্লুরিসি সারবার পর থেকেই ও হয়ে গেল গাট্টাগাট্টা জোয়ান, আর চোখদুটোও বেশ বড়-বড় আর উড়োন-তুবড়ির মতন ! জয়দেবকে দেখে আমার হিংসে হতো, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতুম, ইস, আমার কেন একবার প্লুরিসি হয় না !

জয়দেব আবার দাড়ি রেখেছে, সেই জন্য এখন তার চেহারা অবিকল চম্বলের ডাকাতের মতন।

জয়দেব বললো, ভাগ্যিস দৌড়োতে-দৌড়োতে এসে সেকেন্ড ক্লাসে উঠেছিলুম, তাই তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এদিকে কোথায় গিয়েছিলি রে ?

অর্থাৎ জয়দেব আজকাল ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াত করে ? লটারির টিকিট পেয়েছে নাকি ? যতদূর মনে আছে জয়দেব কলেজের পড়াশুনো শেষ করেনি। ওর পক্ষে ভালো চাকরি পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। অথবা বলা যায় না, হয়তো কোনো এম এ-এর সাগরেদ হয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে।

ট্রেনের এতগুলো লোকের মধ্যে পাছে জয়দেব আমাকে হেনস্থা করে কথা বলে, তাই গলায় বেশ একটা শক্ত মিত্র স্টাইলের ব্যক্তিত্ব এনে বললুম,

শান্তিনিকেতন গিয়েছিলুম রে। ওখানে একটা বক্তৃতা ছিল।

জয়দেব বললো, বক্তৃতা? তুই কি প্রফেসর হয়েছিস নাকি?

—না, মানে, একটা সেমিনার। ‘রবীন্দ্র-সাহিত্যে ঠাকুরদার ভূমিকা’, এই বিষয়ে...

—পয়সা দেয়?

—দেবে না কেন। শান্তিনিকেতন একটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, প্রাইম মিনিস্টার তার আচার্য

—ফার্স্ট ক্লাস ভাড়া দেয় না? নাকি, ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়াটা মেরে দিয়ে তুই সেকেন্ড ক্লাসে যাচ্ছিস?

অন্য যাত্রীরা ডাব-ডাব করে তাকিয়ে, দু’কান দিয়ে সোঁ-সোঁ করে আমাদের কথাগুলো গিলছে। নাঃ, জয়দেবটা আর প্রেস্টিজ রাখতে দেবে না। আমি যদি কাল ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্টও হই, তা হলেও জয়দেব এই সুরেই কথা বলবে আমার সঙ্গে। পুরিসির কী মহিমা, পুরিসির কী ব্যক্তিত্ব!

—তুই এদিকে কোথায় গিয়েছিলি, জয়দেব! তোদের বাড়ি তো ছিল রামরাজাতলায়, তাই না?

—এখনো সেখানেই আছে। ফোর-ফাদার্সদের বাড়ি, তাই ছাড়িনি। না হলে ইচ্ছে করলে অনেক জায়গাতেই থাকতে পারি। এখন ব্যবসা করছি, বুঝলি? চাকরি-বাকরির তো সুবিধে হলো না, তাই এই লাইনেই...

—কিসের ব্যবসা রে? চিড়ে-মুড়কির?

—চিড়ে...মানে...তুই হঠাৎ এই কথাটা বললি কেন? চিড়েমুড়কির কথা বললি কেন?

—কী জানি, হঠাৎ মনে এলো, অনেকদিন চিড়েও খাইনি, মুড়কিও খাইনি। কেন যে মনে পড়ে গেল তা জানি না!

—তুই অনেকটা কাছাকাছি এসেছিস, বুঝলি নীলু! যে-ব্যবসা ধরেছি, তাতে একেবারে মুড়ি-মুড়কির মতন পয়সা! সব জামার বড়-বড় পকেট বানাতে হয়েছে।

আমাদের পাশে দু’তিনজন লোক আমাদের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। জয়দেব তাদের ঠেলে দিয়ে কড়া গলায় বললো, না দাদা, এত সহজে ব্যবসার সিক্রেট শুনে ফেলা যায় না। এ ছেলেটা আমার পুরনো বন্ধু, এর কাছে সব কিছু বলা যায়, আপনারা নাক গলাচ্ছেন কেন?

সেই লোকগুলোর মধ্যে একজন রসিকতা করার চেষ্টা করে বললো, না, মানে, আপনাকে দেখে ব্যবসাদার মনে হয় না কি না!

জয়দেব চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তা হলে আমাকে দেখে কী মনে হয় ? ব্যবসাদারদের বুঝি টিপিক্যাল কোনো চেহারা আছে ?

—আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি কুস্তি-টুস্তি করেন !

—হ্যাঁ, কুস্তিও করি । লড়বার ইচ্ছে আছে ?

—ওরে বাবা, আমি না, আমি না, আমাদের পাড়ার জগুদা আছেন ।

তারপর সবাই একেবারে চুপ । জয়দেব সবার দিকে একবার সগর্ব দৃষ্টি দিয়ে, আমার কাঁধে পুনরায় একটা রাম-চাপড় দিয়ে বললো, চল, পরের স্টেশনে নেমে ফাস্ট ক্লাসে উঠবো !

জয়দেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুফল হলো এই যে, আমার মনের মধ্যে আমি যে রোমান্টিকতার ফানুস ওড়াচ্ছিলুম, সেটা চুপসে, ছিড়ে ফর্দফাঁই হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল । জয়দেবের সঙ্গে রোমান্টিকতার যেন অহি-নকুল সম্পর্ক ।

আমরা শ্রীরামপুরে নামলুম, কিন্তু ফাস্ট ক্লাসে আর ওঠা হলো না । জয়দেব বললো, যেতে দে, এই ট্রেনটা যেতে দে । এখান থেকে আরও কত ট্রেন আছে । তোর নিশ্চয়ই কোনো কাজ নেই, এখানে আমার একটা সাইট দেখে আসবো ।

—সাইট মানে ?

—শ্রীরামপুরে একটা বাড়ি বানাচ্ছি, তিন তলার ভিত, বড় প্রজেক্ট ।

—তুই এখানে বাড়ি বানাচ্ছিস ?

—হ্যাঁ, এখানে একটা, চন্দননগরে দুটো, বালিতে পাঁচখানা, তাদের শান্তিনিকেতনেও তো গোটা তিনেক বানিয়েছি, ফোর্থটাতে হাত দেবো সামনের হপ্তায় ।

আমার মুখখানা নিশ্চয়ই তালের বড়ার মতন হয়ে গিয়েছিল, তা দেখে জয়দেব হো-হো করে হেসে উঠে বললো, তুই কি ভাবছিস, সব আমার নিজের বাড়ি ? আরে না রে, এসব অন্য লোকের, আমি তো এখন বাড়ি বানাবার কন্ট্রাক্টরি করি, এতেই তো এখন কাঁচা পয়সা ! আমি 'টার্ন কী' প্রজেক্ট করি, বুঝলি । তার মানে জানিস ? আমি কাস্টোমারদের কাছে বাজেট ফেলে দিয়ে বলি, এই মাল ছাড়ুন, চার মাসের মধ্যে কমপ্লিট বাড়ি পাবেন । দরজার চাবি তুলে দেবো আপনার হাতে । প্ল্যান স্যাংশান থেকে ইলেকট্রিসিটি কানেকশন আনবার যত রকম হুজ্জাত ঝামেলা সব আমার ! আমি অ্যাট র্যান্ডম ঘুস দিয়ে ওসব দু'চারদিনে বার করে আনি । অধিকাংশ মধ্যবিস্ত বাঙালীই তো বাড়ি সম্পর্কে কিছু বোঝে না, তারা আমার প্রস্তাব লুফে নেয় । আমার ক্লীন আঠারো থেকে বাইশ পার্সেন্ট প্রফিট থাকে ।

—বাঃ বাঃ, তুই তো দারুণ করছিস রে, জয়দেব ।

—তুই একটা বাড়ি বানাবি, নীলু ?

একটুও দ্বিধা না করে আমি বললুম, হ্যাঁ !

—তুই কী রকম বাড়ি চাস বল ? বাংলা প্যাটার্ন, না...

—ওসব কিছু নয় । আমার বাড়ি এমন হবে যে তার কোনো ভিত থাকবে না, একতলা, দোতলা থাকবে না, শুধু তিনতলায় দু'খানা ঘর, ব্যস !

চোখ কুঁচকে আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জয়দেব বললো, একখানা গান আছে এই রকম, তাই না রে ?

—তুই আবার গানও শুনিস নাকি ?

—ঐ গানটা গেয়ে শোনা তো !

—আরে, এই স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমি গান শোনাবো নাকি ?

—শোনা, শোনা, দু'লাইন শোনা । বেশ চনমনে খিদে পাচ্ছে, কচুরি-ফচুরি খাবো বুঝি, তার আগে একটু গান শুনলে জমবে !

—আরে আমি গান গাইতে পারি না, জয়দেব ।

—ধর ধর ধর, দেরি করিসনি !

—“কী ঘর বানাইনু আমি শূন্যের মাঝার

লোকে বলে,

বলে রে, ঘর-বাড়ি ভাল না আমার....”

—দেবো, তোকে একদিন ঐরকমই একখানা বাড়ি করে দেবো । বড়-বড় পিলার তুলে....একতলা, দোতলা থাকবে না, তিনতলার হাইটে ঘর হবে ।

গরম-গরম কচুরি ভাজছে । শ্রীরামপুরের কাঁচাগোলা নাকি বিখ্যাত, তার সঙ্গে চা । জয়দেব যতটা খাবে, আমাকেও ততটাই খেতে হবে ।

জয়দেবের সঙ্গে কিছুদিন ঘুরলে, আমি যে নীললোহিতের বদলে গোললোহিত হয়ে যাবো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।

খাওয়া-দাওয়ার পর জয়দেব একটা রিক্সা ডেকে বললো, চলো, গঙ্গার ধার ! নিরিবিলা ফাঁকা জায়গায় মাটি কাটার কাজ চলছে, এক পাশে কিছু ইঁটের স্তুপ । সবে মাত্র ভিত কাটার কাজ চলছে । জনাপাঁচেক মজুরের কাজ পর্যবেক্ষণ করছে জয়দেবের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ।

জয়দেব তার দামী সিগারেটের প্যাকেট থেকে সহকারীটিকে একটি সিগারেট দিল । পরে সে আমাকে বলেছিল, বস্-এর হাত থেকে এরকম সিগারেট পেলে নাকি কর্মচারীরা বশব্দ থাকে ।

দু'চারটে কাজের কথা সেরে নেবার পর জয়দেব ইঁটের পাঁজার ওপর বসে পড়ে বললো, আয় নীলু, একটু জিরিয়ে নিই এখানে, গঙ্গার হাওয়ায় তাড়াতাড়ি

কচুরি-ফচুরি হজম হয়ে যাবে ।

তারপর একখানা ইঁট তুলে নিয়ে বললো, এক নম্বর মাল । বাজে-বাজে মেটেরিয়াল দিই না । তুই ইঁট চিনিস ? এটা ধরে দ্যাখ !

—ইঁট আবার দু'নম্বর, তিন নম্বর হয় নাকি রে ?

—হাঃ হাঃ হাঃ, তোরা শুধু বই মুখস্থ করেছিস, আর কিছুই শিখলি না । ইঁট, বালি, সুর্কি, সিমেন্ট সবই দু'নম্বর তিন নম্বর আছে । আমার কাছে কেউ ওসব পাবে না ।

তারপর মিনিট দশেক ধরে জয়দেব আমাকে ইঁট বিষয়ে জ্ঞান দিল ।

সে যে আমার তুলনায় কত বাস্তব-জ্ঞানী তার প্রমাণ দিতে চায় । শান্তিনিকেতনের গান-বাজনা-সংস্কৃতি ইত্যাদির ওপর সে দমাস-দমাস করে ইঁটের বাড়ি মারতে লাগলো । গঙ্গার ধারে বসে এইসব চমৎকার আলোচনার বিষয় ।

বিভিন্ন জায়গায় এক সঙ্গে বেশ কয়েকটা বাড়ি বানাবার কাজ চললেও জয়দেব নিজে সব কটা জায়গায় প্রায় প্রত্যেকদিন যায় । সে যেমন লাভ করে, তেমনি খাটেও তো বটে ।

কথায়-কথায় জয়দেব বললো, এই বাড়িটা কার হবে জানিস ? রবীন সরকার বলে এক ভদ্রলোকের । উনি আই এ এস অফিসার ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন । নাম শুনেছিস ?

আমি দু'দিকে মাথা নাড়লুম ।

—ভদ্রলোকের বালিগঞ্জে একটা ফ্ল্যাট আছে । তবে শিগিরই ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন, একমাত্র ছেলে, তাকে ঐ বালিগঞ্জের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে বুড়ো-বুড়ি এই শ্রীরামপুরের গঙ্গার ধারে এসে থাকতে চায় । শীতকালের আগেই এ-বাড়ি কমপ্লিট করতে হবে । তিনতলা বাড়ি, এত তাড়াতাড়ি শেষ করা কি চাট্টিখানি কথা ?

—শুধু বুড়ো-বুড়ি থাকবে, তার জন্য তিনতলা বাড়ির দরকার কী ?

—পরস্রা আছে তাই বড় বাড়ি বানাচ্ছে । সে তুই কী বুঝবি ! বড় অফিসার ছিলেন, ছোট বাড়িতে থাকলে কি মানায় ? একটা হেঁকড় রাখতে হবে তো । ভদ্রলোকের ছেলে একটা টায়ার কোম্পানিতে পারচেজ অফিসারের কাজ করে, দু'হাতে টাকা রোজগার করছে, উপরি, বুঝলি, তুই আমি যাকে ঘুস বলি ওরা তাকে বলে কমিশান, পারসেন্টেজ ।

—টায়ার কোম্পানি ? কী নাম বল তো ?

—কোম্পানির নাম ?

—না, ভদ্রলোকের ।

—ভদ্রলোকের নাম তো বললুম, রবীন সরকার ।

—না, ছেলের নাম ?

—ছেলের নাম কী জানি । একবার শুনেছিলুম, মনে নেই । কোনো পার্টির সঙ্গে কন্ট্রাস্ট করার আগে আমি তার ফিনানশিয়াল কন্ডিশন ভালো করে জেনে নিই । পয়সা আছে, ওদের প্রচুর পয়সা আছে । আমি যদি দু'পাঁচ হাজার টাকা এদিক-ওদিক করি, ওরা মাইন্ড করবে না ।

জয়দেব ওর কথার মধ্যে যথেষ্ট ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে । সবই ওর ব্যবসা সংক্রান্ত শব্দ । ও ফিনানশিয়াল কন্ডিশন বলতে পারে, কিন্তু ও কি লিরিক বা সোপ্রানো-র মতন সাধারণ ইংরিজি শব্দের মানে বলতে পারবে ?

আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলুম । রিটার্ড আই এ এস অফিসার রবীন সরকারের ছেলে...টায়ার কোম্পানিতে কাজ করে...শিগগির বিয়ে হবে...রাজা সরকার নয় তো ? অন্য কেউও হতে পারে । এ রকম কত সরকার আছে । আর যদি রাজা সরকারেরই বাবার বাড়ি হয় এটা, তাতেই বা আমার কী আসে যায় !

কিন্তু চাকরিতে ঘুস, মানে কমিশন, উপরি রোজগার....

যাদের উপরি রোজগারের সুযোগ নেই, তারাই অন্যদের হিংসে করে । কিন্তু ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয় । কে কোথায় উপরি রোজগার করছে, তাতে আমার মাথা ঘামাবার কী দরকার ?

কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু...

কিসের খটকা লাগছে ? যদি ঐ ছেলেটিই রাজা সরকার হয়...চাকরিতে যারা উপরি রোজগারের ধান্দায় থাকে, তাদের এক ধরনের মানসিকতা হয়, ভালো-মন্দ বিচার করার আমি কেউ তো নই, তবু, ঐ ধরনের মানুষ কি অনিন্দিতা নামে এক রাজকুমারীর যোগ্য স্বামী হতে পারে ? সেইজন্যই রাজা সরকার দোকান থেকে ময়ূরের পালক কিনে দেবার কথা বলছিল ?

—তোর ঐ রবীন সরকার বালিগঞ্জের কোথায় থাকে রে ?

—হঠাৎ তুই আমার একজন পার্টিকে নিয়ে এত ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়লি কেন ?

—এখন নামটা চেনা-চেনা লাগছে । যতদূর মনে পড়ছে, ঐ ভদ্রলোক আমাকে একদিন দোতলা বাসে অপমান করেছিলেন । চেষ্টায়ে বলেছিলেন, আমি কত বড় অফিসার জানো ?

—তোর মাথা খারাপ । ঐসব লোক কখনো বাসে চড়ে ? সদ্য মারুতি কিনেছে । আর সেই এক লোক হলোই বা কী, তুই কি এখন তার বাড়ি বয়ে

অপমানের শোধ নিবি নাকি !

—ঠিকানাটা জানলে টেলিফোনে হুমকি দেবো !

—ওসব চলবে না, নীলু, আমার পার্টির সঙ্গে ওসব আমি অ্যালাউ করবো না । তবে, হ্যাঁ, বাড়িটা কমপ্লিট হয়ে যাক, ফুল পেইন্ট পেয়ে যাই, তারপর না হয় তোর হয়ে আমিই একদিন ভদ্রলোকের অ্যাইসান পা মাড়িয়ে দেবো যে বাপের জন্মে ভুলতে পারবে না । চল, এবার ওঠা যাক ।

স্টেশনে এসে পরবর্তী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি বেঞ্চে বসে, একটা বাচ্চা বাউল একতারা বাজিয়ে গান ধরলো আমাদের সামনে এসে ।

জয়দেবের এখন পেট ভর্তি আছে, এই সময় তার গান পছন্দ নয় । সে হাত নেড়ে দাঁত মুখ খিচিয়ে বললো, এই যাঃ যাঃ ! অন্যদিকে যা, এখানে কিছু হবে না ।

গানটা আমি আগে শুনিনি, কথায় কিছু নতুনত্ব আছে । কিন্তু এখন আর বাউল গান আমার কোন্ কাজে লাগবে ? আমি অন্য দিকে মুখ ফেরালুম ।

॥ ৫ ॥

টেলিফোন গাইডে দু'জন রবীন সরকারকে পাওয়া গেল, একজন গরচায়, আর একজন কাঁকুলিয়ায় । এ ছাড়া আর.এন.সরকার, আর.পি.সরকার এইসব অজ্ঞশ । গরচা দিয়েই শুরু করা যাক ।

আমাদের পাড়ায় নিউ ডেকরেটার্স দোকানটায় গিয়ে আমি মাঝে-মাঝে বসি । যখনই বিনা পয়সায় টেলিফোন করার দরকার হয় । উপেনদা অবশ্য টেলিফোনের ডায়ালে একটা ছোট্ট তালা দিয়ে রাখেন, মুখ-চেনা কেউ এসে টেলিফোন করতে চাইলে উনি অম্লান বদনে বলেন, চাবিটা তো খুঁজে পাচ্ছি না ! এ-পাড়ার কোন্ একটি কলেজে-পড়া মেয়ে নাকি একবার এই টেলিফোনে তার প্রেমিকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল । সেই থেকে তিনি অন্য কারুকে টেলিফোন ব্যবহার করতে দিতে চান না । আসল কারণটা হচ্ছে কৃপণতা ।

কিন্তু এর চেয়ে ঢের-ঢের বড় কৃপণদের আমি চরিয়ে খেয়েছি । এক-একজন কৃপণকে ট্যাকল করার এক-এক রকম কায়দা । এর জন্য মানব চরিত্র স্টাডি করা দরকার । আমি যাওয়া-আসার পথে উপেনদার দোকানের দিকে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে দেখতে পাই চেয়ারটা খালি । তার একটা নির্দিষ্ট ব্যবধান আছে, দু' থেকে আড়াই ঘণ্টা । অর্থাৎ উপেনদার পেটের রোগ, বাড়িওয়ালার বাথরুম

ব্যবহারের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

দোকানের ছোকরা কর্মচারীটি আমাকে ভালোবাসে, তার মালিককে কেউ ঠিকালে সে খুব খুশি হয়। একবার উপেনদাকে কে যেন একশো টাকা কম দিয়েছিল, তাতে ঐ অমূল্য উপেনদার পেছনে দাঁড়িয়ে নেচেছে।

ক্যাশ ড্রয়ারে চাবিটা থাকে, টপ করে খুলে ডায়াল ঘোরাতে শুরু করি, অন্তত চার-পাঁচটা ফোন করার সময় পাওয়া যায় স্বচ্ছন্দে।

কিন্তু আমার এত উদ্যোগ, এত পরিকল্পনা সব ব্যর্থ করার জন্য সদা সতর্ক হয়ে আছে টেলিফোন দফতর। ওরা তো অমূল্যদার মতন কৃপণদের সাহায্য করার জন্যই ব্যস্ত। যতই ডায়াল ঘোরাও লবডঙ্কা! হয় এনগেজড টোন, অথবা খট করে একটা শব্দ হবার পর সব চূপচাপ। দুই রবীন সরকারেরই ঐ ব্যাপার। অন্য দু'একটা আর সরকার ট্রাই করলুম, সাড়া নেই। গাইডের যাবতীয় সরকারই বোধহয় আজ টেলিফোন-আওতার বাইরে।

তালা-ফালা লাগিয়ে সব ঠিক-ঠাক করে রাখলুম। অমূল্য বললো, ঐ যন্ত্রটা ভেঙে ফেলুন না।

আমি বললুম, তুই একদিন ধুলো ঝাড়ার নাম করে ওটাকে একটা আছাড় মারিস!

সঙ্গে-সঙ্গে বানবন্ করে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। এ তো বেশ মজার ব্যাপার, ফোন করা যাবে না, কিন্তু আসবে। উপেনদার খুব মজা!

অমূল্য ফোন তুলে পাঁচবার শুধু হ্যাঁ বলে রেখে দিল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, কে ফোন করেছিল?

অমূল্য ঠোঁট উন্টে বললো, কী জানি!

আশ্চর্য, এই সব সত্বেও উপেনদার দোকান বেশ ভালোই চলে। দু'খানা ঠেলাওয়ালা প্রতিদিন প্যান্ডেল বাঁধার জিনিসপত্র নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। এখন বিয়ের সিজন্, বর্ষাকালের বিয়েতে ডেকরেটরদের পোয়াবারো। লোকেরা শীতকালে বিয়ে করলেই তো পারে।

চুরি করে ফোন-টোনের চেষ্টা করে পালিয়ে যাবার পাত্র আমি নই। বসে রইলুম গ্যাঁট হয়ে। একটু বাদে ফিরে এলো উপেনদা, কোমরের ধুতির কবি আঁট করে বাঁধতে-বাঁধতে, মুখে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব।

—কী খবর, নীলুচন্দর!

—এই যে উপেনদা, তোমার এখানে একটু চা খেতে এলাম।

—হ্যাঁ, চায়ের টাইম হয়ে গেছে। অমূল্য! দু' কাপ চা বলে আয়। আর চারটে নোনতা বিস্কুট, আচ্ছা থাক, বিস্কুট দরকার নেই, দুটো চিংড়ির কাটলেট

আনবি ।

উপেনদার এতখানি ঔদার্য কোনোদিন দেখিনি । হঠাৎ চিংড়ির কাটলেট ? আমি তো উপেনদার খদ্দেরও নই ।

—কী ব্যাপার, উপেনদা ?

—কিসের কী ব্যাপার রে ?

—আজ মেজাজটা বেশ খুশি-খুশি দেখছি ? আপনার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে নাকি ?

—আরে অন্য লোকের বিয়ের ঠালা সামলাতে-সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, যা বিয়ের হিড়িক পড়েছে এই সীজনে, চেনা গ্রাহকদেরই সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারছি না ! দ্যাখ না এই পুরো মাসটার লম্বা লিস্ট, প্রত্যেকদিন দুটো করে ।

—তা বলে চিংড়ির কাটলেট খাবেন ? আপনার না পেটের

—আজ পেটটা বেশ ভালো আছে । বাড়িতে, বুঝলি, সিঙ্গিমাছ কাঁচকলার বোল ছাড়া আর কিছু খেতে দেয় না । ভালো-মন্দ যদি খেতেই না পেলুম, তা হলে আর টাকা রোজগার করে লাভ কী !

—তা তো বটেই !

উপেনদার চার মেয়ে । উপেনদা মেয়ের বিয়েকে বলেন পার করা । তাঁর ভাষায়, তিনি তিনটি মেয়েকে পার করতে পারলেও ছোট মেয়েটি গলার কাঁটা হয়ে আটকে আছে । উপেনদার ছোট মেয়ে শ্রীলাকে আমি চিনি, সে ফিলসফিতে এম এস-সি পাশ করে এখন পি-এইচ ডি-র জন্য তৈরি হচ্ছে । বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে সে মাথাই ঘামাতে চায় না । ডেকরেটরের মেয়ে হয়ে শ্রীলার কেন যে দর্শন শাস্ত্র পড়ার ঝোঁক হলো তা কে জানে । মেয়ে যে দর্শন নিয়ে এম এ পাশ করেছে, তা উপেনদা জানলেন মাত্র কয়েকদিন আগে । তিনি শুধু জানতেন মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে ।

শ্রীলা বেশ তেজী মেয়ে । সে যদি এখন বিয়ে করতে না চায়, তাতে ক্ষতি কী আছে ? তার যখন খুশি সে তার জীবনসঙ্গী খুঁজে নেবে ।

কিন্তু উপেনদার মতে “বয়স্থা” মেয়ে বাড়িতে রাখা মানেই “গলার কাঁটা” পুষে রাখা ।

আমাকে তিনি প্রায়ই বলেন, এই নীলু, একটু খোঁজখবর নিয়ে দ্যাখ না, মেয়েটার জন্য একটা ভালো মতন পাত্র জোগাড় করতে পারিস কি না !

চোখের সামনেই যে জলজ্যাস্ত আমি আছি তা উপেনদার খেয়াল হয় না । উপেনদার ছোট ভাই রূপেন আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়তো, সে হঠাৎ বোকার

মতন আত্মহত্যা করেছে। সেই জন্যেই উপেনদা আমাকে একটু স্নেহ করেন, কিন্তু মেয়ের পাত্র হিসেবে গ্রাহ্য করেন না আমাকে। আমি কি এতই ফ্যালনা যে একটু প্রত্যাখ্যানের সুখও পেতে পারি না?

উপেনদা অনেকগুলো নাম ঠিকানা লেখা লম্বা একটা লিস্ট আমার সামনে ফেলে বললেন, একখানা ট্রাজেডিয়াস গল্প শুনবি? গল্প নয়, সত্যি ঘটনা, ফ্যাক্ট!

উপেনদা বোধহয় হিলেরিয়াস, সিরিয়াসের সঙ্গে মিলিয়ে ট্রাজেডিয়াস শব্দটি বানিয়েছেন। তা মন্দ কী!

উপেনদা সেই কাগজের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে বললেন, এই যে দেখছি সত্যেন নিয়োগী, বেলেলিয়াস রোডে বাড়ি, এই ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছিল, বুঝলি, পনেরো হাজার নগদ আর বিশ ভরি সোনা, সব দিতে রাজি হয়েছিলুম, কিন্তু মেয়ে আমার বঁকে বসলো, বলে কি না, একুশ বছর বয়েস হয়ে গেছে, বেশি চাপ দিলে বাড়ি থেকে পালাবে! আজকালকার খিঙ্গি মেয়েদের কি কাণ্ড। মেয়ে বাড়ি থেকে পালালে আমারই মুখে চুন-কালি পড়বে...এখন সেই সত্যেন নেউগীর ছেলের ধুমধাম করে বিয়ে ঠিক হয়েছে অন্য জায়গায়, আর আমাকেই সেই বিয়ের প্যাণ্ডেল বাঁধতে হবে। অ্যাঁ? তুই-ই বল!

—সত্যি বড্ড শ্যাড, উপেনদা। ও বাড়ির কাজটা আপনি না নিলেই পারতেন।

—কী করবো বল, খদের হলো লক্ষ্মী, কক্ষনো ফেরাতে নেই যে!

—ওদের প্যাণ্ডেলের চালে ফুটো রাখুন তা হলে, যাতে বৃষ্টি হলে বর-বউ ভেসে যায়!

—ধ্যার! আর ওসবে কী হবে!

চিংড়ির কাটলেট এসে গেল, দুঃখ ভুলবার জন্য উপেনদা একখানা কাটলেট তুলে বড় একটা কামড় বসালেন।

চা দিয়েছে দুটো ময়লা গেলাসে। উপেনদা শুধু তেরপল-বাঁশ দিয়ে প্যাণ্ডেলই বানান না, ফার্নিচার, ক্রকারি-কটলারিও ভাড়া দেন। ডেভেলপমেন্টের চেয়ার আছে দু'খানা, চেয়ারের পেছনের আলমারিতে সারি-সারি গোলাপী রঙের কাপ-ডিশ। ঐ রকম একটা দামী কাপে একদিন চা খেতে ইচ্ছে করে।

নাম ঠিকানা লেখা লিস্টটা আমার সামনে পড়ে আছে, হঠাৎ সেটাতে চোখ আটকে গেল। একেবারে শেষের নামটা হলো রবীন সরকার, কাঁকুলিয়ার ঠিকানা!

উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করে বললুম, উপেনদা, এই যে এই রবীন সরকার নামে ভদ্রলোককে আপনি চেনেন ? ইনি কি আই এ এস অফিসার ছিলেন ?

তুরূ কুঁচকে উপেনদা বললেন, তা কে জানে ! অর্ডার দিয়ে টাকা অ্যাডভান্স করে গেছে, কিসের অফিসার তা জানি না।

—বাড়িটা কি ফ্ল্যাট বাড়ি ?

প্রত্যেক নামের পাশেই কোডে কী যেন লেখা আছে। সেটা দেখে উপেনদা বললেন, হ্যাঁ, ফ্ল্যাট বাড়ি। ছাদের ওপর ম্যারাপ বাঁধতে হবে, হাজার স্কোয়ার ফিট কভারড এরিয়া, ভেতরে ফুলের ডিজাইন করতে হবে...

—ছেলের বিয়ে, না মেয়ের বিয়ে ?

উপেনদা খামের পাশের কোড আবার দেখলেন। ছেলে কিংবা মেয়ে, তাও কোডে লেখা ?

—বউভাত !

—কার বাড়ি, ছেলে না মেয়ের বাড়ি, সেটা জানতে চাইছি।

—আ গেল যা ! মেয়ের বাড়িতে কখনো বউভাত হয় ? এমন কথা কেউ ছুঁ-ভারতে শুনেছে ? বিয়ের দিন যে-থাকে কনে, স্বশুরবাড়িতে এলে সে হয় বউ। তবে না বউভাত হবে !

আমার এ হেন অজ্ঞতায় মর্মাহত হবার ছলে মুখ নিচু করে আমি রবীন সরকারের বাড়ির ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, তারিখ ? কত তারিখ ?

—এ মাসের আঠাশে। কেন রে, তুই চিনিস নাকি ?

—হ্যাঁ, চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। ও বাড়িতে আমি অনেকবার গেছি !

—কাটলেটটা বেড়ে বানিয়েছে রে ? আর একখানা করে হবে নাকি।

—উপেনদা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? দু'খানা চিংড়ির কাটলেট তোমার সহ্য হবে ?

—দ্যাখ, এত লোকের বিয়েতে প্যাণ্ডেল বানাই, কোন শালা আমাকে কিন্তু নেমস্তন্ন করে না। আমাকে কাটলেট, ফিসফ্রাই নিজের পয়সায় কিনে খেতে হয় !

—তুমি তা হলে কেটারিং-এর ব্যবসা ধরো। প্রত্যেকদিন অনেক চপ্পা কাটলেট একট্টা হবে।

এই আলোচনাটা আর বেশি দূর গড়ালো না, একজন ~~খদ্দের~~ এসে হাজির হলো, সেই সুযোগে আমি কেটে পড়লুম।

তা হলে, শান্তিনিকেতনে সাইকেলে চড়ে যে সারল্য-~~স্বাধীন~~ রাজকুমারীটি ঘুরে

বেড়াচ্ছে, সে-ই এই কাঁকুলিয়ার ফ্ল্যাট বাড়িতে নববধু হয়ে আসবে। এতগুলো মিল যখন...তারিখটাও মোটামুটি মিলে যাচ্ছে...।

কেন জানি না, ঐ রিটার্ড আই এ এস অফিসার রবীন সরকারের সঙ্গে দেখা করার একটা উদগ্র ইচ্ছে হলো আমার। একবার ঘুরেই দেখে আসা যাক না।

বাসে চেপে বসলুম কিন্তু যাত্রাপথে বারবার বাধা পড়তে লাগলো। প্রথম কথা, কালীঘাটের কাছে এসে বাসটা গেল খারাপ হয়ে। বর্ষার সময় সরকারী বাসগুলো খারাপ হবার প্রতিযোগিতা নিয়ে রাস্তায় বেরোয়। প্রাইভেট বাস খারাপ হলে টিকিটের পয়সা ফেরত দেয়। কিন্তু সরকারী বাসের কন্ডাক্টর বলে, ঐ টিকিটে পরের বাসে চাপুন!

কিন্তু পরের বাস কখন আসবে সেটা তার মর্জি। তার বুঝি মাঝপথে খারাপ হবার অধিকার নেই?

এই সময় নামলো তোড়ে বৃষ্টি। দু'খানা প্রাইভেট বাস এর মধ্যে যাত্রী তোলার লোভে আমাদের ভিড়টার কাছে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু আমাব জেদ আমি ঐ সরকারী টিকিটেই সরকারী বাসে যাবো, খামোকা আবার পয়সা খরচ করবো কেন?

কুড়ি মিনিট বাদে ঐ রুটের একটি সরকারী বাসকে আসতে দেখা গেল। আমাদের প্রাক্তন কন্ডাক্টর এগিয়ে গিয়ে হাত তুলে তাকে দাঁড়বার জন্য অনুরোধ জানালো, কিন্তু সে থামলো না। কী জন্য যেন তার অভিমান হয়েছে।

এর মধ্যে আমার বৃষ্টি ভিজে জবজবে অবস্থা।

মোট পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ব্যবধানে আমি আর একটি বাসে চড়তে পারলুম। পুরনো বাসের যাত্রী শুধু আমি। এ বাসটা বেশ ফাঁকা। একটা সীট পেয়ে বসতে যেতেই কন্ডাক্টর বললো, টিকিট!

আমি আগের টিকিটটি সযত্নে রক্ষা করেছিলুম, প্যান্টের পকেটে মুঠো করে ধরা ছিল, ভিজতেও দিইনি। সেটা বার করে দেখাতেই কন্ডাক্টর বললো, এটা আবার কী? ভদ্রলোকের এক কথার মতন একবার টিকিট কেটে সব বাসে চাপবেন ঠিক করেছেন নাকি?

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আগে যে-বাসটা খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল... কন্ডাক্টরটি বড্ড তর্কিক ধরনের। সে টেকনিক্যাল পয়েন্ট ধরে বললো, কই ঐ বাসের কন্ডাক্টর তো আমায় কিছু ডেকে বলেনি। আপনার টিকিটের পেছনে কিছু লিখে দিয়েছে?

অত বৃষ্টির মধ্যে আগের কন্ডাক্টর তার নিজস্ব বাসে উঠে বসেছিল, সে কথা এ লোকটি মানবে না। কিন্তু আমার বাঙালের গৌ, আমি কিছুতেই নতন টিকিট

কাটবো না । কথাবার্তার টান শুনে বোঝা গেল, এই কন্ডাক্টারটিও বাঙাল, সুতরাং দুই বাঙালের গৌঁ মিলে একেবারে রতনে-রতন !

অন্য যাত্রীরা যথারীতি ভাগ হয়ে গেল দুই পক্ষে । তারপর সিদ্ধান্ত হলো, আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে বালিগঞ্জ স্টেশন বাস গুমটিতে, সেখানে এই কন্ডাক্টারের উর্ধ্বতন কর্মচারীরা বিচার করবে ।

আমার তাতে আপত্তি নেই । বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে কাঁকুলিয়া যেতে সুবিধেই হবে । আমি একডালিয়ার মোড়ে নামবো ভেবেছিলুম, আর বড় জোর দু'তিনটে স্টপ ।

বালিগঞ্জ স্টেশনে-মামলাটা মোটেই জটিল হলো না । বাসের কন্ডাক্টারটি আমাকে নিয়ে, হাত ধরে টানতে-টানতে নয় অবশ্য, পাশাপাশি, অফিস ঘরে যার কাছে নিয়ে গেল, সেই লোকটি এই বাদলার মধ্যে মুড়ি-বেগুনি খেতে-খেতে একটা বাংলা উপন্যাস পড়ছিল । নিশ্চয়ই খুব রোমাঞ্চকর জায়গা, বইয়ের পাতা থেকে চোখ সরাবার ইচ্ছেই নেই তার । আমাদের কথা একটুখানি শোনামাত্র সে আমার দিকে বাঁ হাতের পাঞ্জা নাড়িয়ে বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, যান, যান, চলে যান ! এতসব বুট ঝামেলার কী দরকার !

আমি আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে, সগৌরবে মাথা তুলে বেরিয়ে এলুম সেই ঘর থেকে । তার পরেই আর একখানা অলৌকিক ।

ফ্ল্যাট বাড়িতে যে-কোনো লোক যে-কোনো তলায় উঠে গিয়ে যে-কোনো দরজায় ধাক্কা মেরে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে পারে । লেটার বক্স দেখে রবীন সরকারের ফ্ল্যাট চিনে নেওয়াও শক্ত কিছু নয় । কিন্তু আমার জামা-প্যান্ট সম্পূর্ণ ভিজ়ে, মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছে, এই অবস্থায় কোনো অচেনা লোকের বাড়িতে কি যাওয়া যায় ? পকেটে একটা রুমালও নেই ছাই ! রুমাল থাকলেই বা কী হতো, সেটাও ভিজ়ে যেত । সিগারেটের প্যাকেটটাও ভিজ়ে গেছে । তাতে অবশ্য ছিল মাত্র একটা ।

প্রথমে একটা সিগারেট টেনে বুদ্ধি ঠিক করা দরকার । এত দূর এসে কিছু একটা না করে ফিরে যাবার কোনো মানে হয় ?

সিগারেটের দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, অমনি পাশের ফলের দোকান থেকে লাল রঙের ছাতার আড়াল সরিয়ে একটি চেনা মুখ আমার নাম ধরে ডেকে বললো, ওমা, নীলু, তুমি এখানে কী করছো ?

এ যে বাউল-গান উৎসাহিনী উজ্জয়িনী ! শান্তিনিকেতনের তুলনায় আজ তার সাজগোজ একটু বেশি । ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, সাঁচি স্তূপের স্টাইলের চুলের খোঁপা ।

আমি বললুম, উজ্জয়িনী, তুমি এখানে কী করে এলে ?

উজ্জয়িনী ছাতা ঘুরিয়ে উণ্টো দিকের বাড়িটা দেখিয়ে বললো, ঐ তো আমার দিদির বাড়ি । কলকাতায় এলে আমরা এখানেই উঠি । সেদিন তুমি আমাদের কিছু না বলে-টলে পালিয়ে এলে, আমরা তোমার ওপর খুব রাগ করেছি ।

আমি একগাল হেসে বললুম, সেদিন বিকেলে রেডিওতে আমার একটা রেকর্ডিং ছিল, একদম ভুলে গিয়েছিলুম । তাই চলে আসতেই হলো....তোমরা শ্রীনিকেতনের দিকে গেলে...আমার মনে পড়লো যে, একটায় একটা ট্রেন আছে ।

—তা বলে একটা চিঠি লিখে আসতে পারলে না ? কলকাতায় তোমার ঠিকানাটা পর্যন্ত জানি না ।

—বাঃ, ফিরেই তো তোমাদের চিঠি লিখেছি । পাওনি ?

—না তো ।

—ক’দিন লাগে চিঠি যেতে ? ঠিক পেয়ে যাবে ফিরে গিয়ে !

—এরকম ভিজে-টিজে কোথা থেকে এলে ?

—এই তো এই ডিপোয় বাস থেকে নামলুম !

—বাসে এলে বুঝি এরকম ভিজতে হয় ? মনে হচ্ছে যেন কোনো পুকুরে ডুব দিয়ে এসেছো !

—না, মানে, বাসে ওঠার আগে—

—চলো, চলো, আমার দিদির বাড়িতে ‘চলো, মাথা-টাথা মুছে নেবে ।

—উজ্জয়িনী, আমার এখন একটু কাজ আছে...তোমরা ক’দিন থাকছো ? আমি পরে না হয়—

—এই অবস্থায় আবার কী কাজ । চলো, পাগলামি করো না । আমার দিদির বাড়িতে যেতে তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই !

শান্তিনিকেতনের স্মার্ট মেয়ে, উজ্জয়িনী আর একটু হলে আমার হাত ধরে টানছিল, আমি বললুম, ঠিক আছে, চলো যাচ্ছি !

বৃষ্টি অবশ্য এখন গুঁড়ি-গুঁড়ি পড়ছে । মেয়েলি ছাতার তলায় দু’জনে যাওয়া যায় না । মানে, উজ্জয়িনীর সঙ্গে আমার ততটা ঘনিষ্ঠতা নেই । উজ্জয়িনীর ব্যবহার এত সাবলীল যে তার সঙ্গে চট করে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, কিন্তু তার সঙ্গে প্রেম-ট্রেন করার চিন্তা মনে আসে না ।

প্রথম সরকারী বাসটা যদি খারাপ না হয়ে যেত, তা হলে আমার চল্লিশ মিনিট দেরিও হতো না, বৃষ্টিও ভিজতুম না । নামতুমও দু’তিন স্টপ আগে । উজ্জয়িনীর সঙ্গে এমন ভাবে দেখা হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না । এমন কি বাস

শুমটির উর্ধ্বতন কর্মচারীটি যদি বাংলা উপন্যাস পড়ায় অতটা নিমগ্ন না হতো, আমাকে মিনিট পাঁচেক জেরা করলেও ততক্ষণে উজ্জয়িনী ফলের দোকান থেকে ফিরে যেত !

উপেনদার দোকানে আড্ডা, সরকারি বাস, বৃষ্টি, পুরনো টিকিট, বাংলা উপন্যাস এই সবগুলো জিনিস মিলে আমাকে উজ্জয়িনীর সঙ্গে আবার দেখা করিয়ে দিল । বাংলা উপন্যাসটা কার লেখা তা দেখে রাখলে হতো, তা হলে চিঠি লিখে লেখককে ধন্যবাদ জানাতুম ।

রাস্তা পেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলুম, হঠাৎ কলকাতায় এলে, শান্তিনিকেতনে এখন ছুটি নাকি !

উজ্জয়িনী বললো, না, ছুটি নিয়েছি । বিয়ের বাজার করতে এসেছি ।

আজ সর্বক্ষণই খালি বিয়ের কথা শুনছি । পৃথিবীশুদ্ধ সবাই কি এই বর্ষাতেই বিয়ে করছে নাকি !

—বিয়ের বাজার ? কার বিয়ে ?

—আমার মাসতুতো বোনের । ঐ তো, সেদিন তোমার সঙ্গে আলাপ হলো, অনিন্দিতা, সে তো আমার ছোড়দির মেয়ে !

আমি থমকে দাঁড়িয়ে একটা বড় ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলুম, এইটা, মানে, এটা তোমার ছোড়দির বাড়ি ?

—না । আমার তিন দিদি । এটা আমার বড়দির বাড়ি । মেজদি থাকে ভাগলপুরে । ছোড়দিরা তো আগে এলাহাবাদে থাকতো, এখন আমাদের এখানেই...চলো, বড়দির সঙ্গে আলাপ করলে তোমার খুব ভালো লাগবে । রেডিও-তে তোমার কিসের রেকর্ডিং ছিল সেদিন ? ব্রডকাস্ট হয়ে গেছে ?

—রেকর্ডিং আমার নিজের ছিল না ঠিক, আমার এক বন্ধুর । পল্লীগীতি গায় । ও ভীষণ নাভাস, সেই প্রথম প্রোগ্রাম তো । গানগুলো অবশ্য আমিই ওকে জোগাড় করে দিয়েছি ।

—ও, তাই বলো । আমরা প্রায় রোজই রেডিও শুনি, তোমার নাম দেখলে...তুমি এর মধ্যে আর নতুন বাউল গান পেলে ?

—ফেরার পথে শ্রীরামপুর স্টেশনে পেয়েছি একটা । একদম নতুন !

—আমাকে দেবে তো ? আমাকে দেবে তো ?

—নিশ্চয়ই ।

একতলায় দোকানপাট, দোতলা ভাড়া, মিড়ি দিয়ে উঠে এলুম তিনতলায় । দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে পা দিয়ে উজ্জয়িনী সহাস্যে বললো, এই, দ্যাখো, কাকে নিয়ে এসেছি !

বসবার ঘরে, একখানা সোফায় হাঁটু দ করে আধশোয়া হয়ে যিনি রয়েছেন, তিনি আর কেউ নন, 'জীবন-দেবতা' বিষয়ক খটমটে প্রবন্ধ লেখক অধ্যাপক চন্দন দত্ত !

বোঝা গেল স্ত্রী যেখানে যান তিনিও সেখানে, শুধু বাজার-হাট করার সময় নিজে না গিয়ে স্ত্রীকে পাঠান। এমন কি এ-বাড়ির প্রায় উল্টো দিকের ফলের দোকানেও তিনি যাননি।

চন্দনদা প্রথমে যেন ভূত দেখলো। তারপর ধড়মড় করে উঠে বললো, এই সেই ছিন্নবাধা, পলাতক বালক ? একে তুমি কোথায় পেলে ? এই ছেলোটা কি কোনো সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিল ?

ফলগুলো একটা টেবিলে রেখে উজ্জয়িনী বললো, ওসব কথা পরে হবে। এই ডান দিকের বাথরুমটায় ঢুকে পড়ো, নীলু। আমি তোয়ালে আনছি। এই, তোমার একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি ওকে দিচ্ছি। ওরকম ভিজে জামা-প্যান্ট পরে থাকলে ওর নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া হয়ে যাবে !

আমার প্রবল আপত্তিতেও উজ্জয়িনী কিছুতেই কর্ণপাত করলো না। এরকম আমি কতবার জলে ভিজেছি, সারারাত মাঠে শুয়ে থেকেছি, এইসব কথা শুনে সে আরও আঁতকে-আঁতকে ওঠে। জামাকাপড় ছাড়া বিষয়ে একটি নারীর সঙ্গে কতই বা তর্ক করা যায়।

ওগুলো হাতে ধরিয়ে দিয়ে উজ্জয়িনী আমাকে প্রায় ঠেলেই ঢুকিয়ে দিল বাথরুমে।

উজ্জয়িনীর মতন এমন দয়াবতী মহিলা আমি খুব কমই দেখেছি। মানুষকে যে কত সহজে আপন করে নিতে পারে। সে এত ভালো তার কারণ সে হাসির মাসি ! তার এই নতুন পরিচয় জেনে আমার চোখে সে আরও সুন্দর হয়ে উঠলো।

চন্দনদাও মানুষ ভালোই, কিন্তু, কথাবর্তা এমন সহজ বাংলায় বললেও প্রবন্ধ লেখার সময় ওরকম বিকট-বিকট শব্দ ব্যবহার করেন কেন। আর যদি ঐ জিনিস তিনি লিখতেই চান, তা হলে একা-একা নিজে পড়লেই পারেন !

চন্দনদার পাঞ্জাবি-পাজামা আমার গায়ে মোটামুটি ফিট করে গেল। এখন আমার ভিজে জামা-প্যান্ট নিয়ে কী হবে ? চন্দনদার এই পাজামা-পাঞ্জাবি কাচিয়ে আবার ফেরত দিতে আসতে হবে !

এই বাথরুমে পাউডার, ক্রিম, চিরুনি ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু এসব ব্যবহার করা যায় না, এমন কি অন্যের চিরুনি ব্যবহার করতেও সাহস পেলুম না। আমার নিজের আপত্তি কিছু নেই, কিন্তু ওরা যদি কিছু মনে করে ?

আঙুল দিয়েই চুল আঁচড়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম ।

এখন একেবারে ঘর-ভর্তি লোক । চন্দনদা, উজ্জয়িনী ছাড়াও একজন বয়স্কা মহিলা, নিশ্চয়ই ইনিই বড়দি, ফুটফুটে ফর্সা, হাসি-খুশি মুখ, সাদা শাড়ি পরা, বিধবা সিথি । দুটি প্রায়-যুবক ও একটি কিশোরী । কিশোরীটি ডাকলো, হাসিদি, হাসিদি !

পাশের ঘর থেকে একটি ঝর্না ছুটে এলো । আমার রাজকুমারী ।

হ্যাঁ, রাজকুমারী হিসেবে ও আমার, অনিন্দিতা হিসেবে ও রাজা সরকারের ।

কী একটা অদ্ভুত পোশাক পরে আছে হাসি, ঠিক মনে হয় একটা ছাপ-ছাপ চাদরকে জামা বানিয়েছে, কাফ্তান না কী বলে যেন একে ! পোশাকটা যেন তার শরীরের চার পাশে উড়ছে ।

হাসি সেই গভীর বিষয় মাথা চোখে আমাকে দু'এক পলক দেখে জিজ্ঞেস করলো, আপনি ইচ্ছে করে বৃষ্টি ভিজছিলেন ? রাস্তায় খুব জল জমেছে বুঝি ?

এমনই আগ্রহ তার কথায় যেন রাস্তায় জল জমলে সে এক্ষুনি ছুটে দেখতে যাবে ।

আমি বললুম, তা নয়, একবার একটু ভিজি গেলুম তো, তাই ভাবলুম, তা হলে আর পুরো ভিজলেই বা ক্ষতি কী !

উজ্জয়িনীর বড়দি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় থাকো ? তোমাকে তুমিই বলছি কিন্তু ।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই । না, আমি খুব কাছে থাকি না, ভবানীপুরের ভেতরে...হ্যাঁচো !

—তোমার খুব ঠাণ্ডা লেগেছে । একটু চা খাও । এই দ্যাখ না, চা-টা হলো কি না ।

চন্দনদা নিজের পাশের জায়গাটা চাপড়ে বললো, এসো নীলু, এখানে বসবে এসো ।

হাসি গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালো । জানলার একটা পাল্লা খুলতেই পাওয়া গেল ট্রেন চলার শব্দ । হাসি বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি অনুভব করলো, তারপর ভিজি হাত ছোঁয়ালো তার চোখে ।

আমি অসভ্যের মতন শুধু হাসির দিকে তাকিয়ে আছি কেন. ঘরে এত লোক থাকতে ? চন্দনদার দিকে তাকাতেই চন্দনদা বললো, তোমার সঙ্গে একদিন রেডিও স্টেশনে যাবো, তোমার তো চেনা আছে অনেকের সঙ্গে ।

—হ্যাঁ । হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ।

মণিমেলায় থাকার সময় একদিন দল বেঁধে দেখতে গিয়েছিলুম ভিকটোরিয়া

মেমোরিয়াল, ইডেন গার্ডেন, রেডিও স্টেশন ইত্যাদি, তারপর আমি আর কোনোদিন রেডিও স্টেশনের ভেতরে ঢুকিনি।

কিন্তু চন্দনদারই জামা-পাজামা পরে আছি, এখন কি ঠুকে কোনো বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করা যায় ?

চা এলো, মুড়ি আর ডিম-ভাজা তার সঙ্গে। সবাই এসে বসলো কাছাকাছি।

উজ্জয়িনী তার বড়দির সঙ্গে কোটা-কাঞ্জিভরম-বালুচরী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। তারই মধ্যে একবার গলা তুলে জিজ্ঞেস করলো, এই তুমি কাল দুপুরে ফ্রি আছো ? একটু বেরুতে পারবে আমাদের সঙ্গে ?

আমি সঙ্গে-সঙ্গে বললুম, না, কাল আমি কলকাতায় থাকছি না।

উজ্জয়িনী হেসে বললো, তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি। চন্দনকে বলছিলুম। তুমি আমাদের সঙ্গে দোকান করতে যাবে, তা কি আমরা আশা করতে পারি !

ওর ভাইপো-ভাইবিরো হেসে উঠলো, একটি ছেলে বললো, উনি চন্দনদার পোশাক পরে আছেন, ইজিলি চন্দনদার হয়ে প্রস্তুতি দিতে পারেন।

চন্দনদা তার পিঠ চাপড়ে বললো, ঠিক বলেছিস। মেয়েদের সঙ্গে বাজারে যাবার নাম শুনলেই আমার জ্বর আসে ! নীলু, তুমি প্লীজ আমার হয়ে এই উপকারটা করে দাও না !

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আমি কালই কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। চন্দনদা, আপনার এই জামা-কাপড় অন্য একজনের হাতে পাঠিয়ে দেবো !

চন্দনদা বললো, আরে বসো, বসো। এক্ষুনি পালাচ্ছে কেন ? চা-টা খেলে না ?

উজ্জয়িনী বললো, দাঁড়াও, তোমার ভিজে জামা-প্যান্ট আমি একটা ব্যাগে ভরে দেবো।

হাসি বললো, আবার জোরে বৃষ্টি এসেছে। আবার আপনার জামা-টামা সব ভিজে যাবে। আপনি মুড়ি খাচ্ছেন না কেন ?

এরপর আমি ঘাড় নিচু করে মুড়ি খেতে লাগলুম। হাসি তার এক মাসতুতো ভাইকে জিজ্ঞেস করলো, বকু, তোর মনে আছে, আমরা যে ডায়মণ্ডহারবার গেলুম, নৌকায় বসে ঝাল-মুড়ি খাওয়া হলো।

সেই ছেলোটী বললো, বাবাঃ, তোমার সঙ্গে আমি আর কোনোদিন নৌকায় চাপছি না। তুমি ইচ্ছে করে যা দোলাচ্ছিলে ! যদি ডুবে যেত।

কিশোরীটি বললো, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি সাহসী হয়। আমার কিন্তু একটুও ভয় করেনি।

সম্পূর্ণ একটি পারিবারিক দৃশ্য, এখানে আমি বাইরের লোক । ওরা যে বিষয়ে কথা বলছে, তাতে আমার রস পাওয়ার কথা নয় । এই আড্ডায় হাসিই মধ্যমণি, কয়েকদিন পরেই সে অন্য বাড়িতে চলে যাবে, তাই সে একটু বেশি খাতির পাচ্ছে ।

আমার মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ জাগলো । একটি নির্মল-হৃদয়া তরুণী নিজে পছন্দ করে এক সুদর্শন যুবাকে বিবাহ করতে যাচ্ছে, এর মধ্যে আমার কোনোরকম মাথা গলানো বা মেয়েটি সম্পর্কে একটা প্রেম-প্রেম ভাব পুষে রাখা খুবই অরুচিকর ব্যাপার । আমি এখানে বসে আছি কেন, আমার এফুনি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া উচিত । অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি এটা নিশ্চয়ই যে-কোনো আদালতে বলতে পারি যে আমি তো ইচ্ছে করে হাসির সঙ্গে দেখা করতে আসিনি । আমি হাসিকে অনুসরণও করিনি একবারও । ঘটনা পরম্পরা আমাকে নিয়ে আসছে বারবার, তাতে আমি কী করবো ?

যাই হোক, যথেষ্ট হয়েছে, এবারে কেটে পড়ো তো নীললোহিত !
বিদায় রাজকুমারী !

॥ ৬ ॥

দুপুরবেলা ঠিক খাওয়ার সময় জয়দেব এসে হাজির । আমার খাওয়া তখন মধ্য পথে, জয়দেব সরাসরি চলে এলো খাওয়ার ঘরে, আমার মা-কে টিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলে বললো, কেমন আছেন, মাসিমা !

সেই দশাসই জোয়ানকে দেখে মা একেবারে হকচকিয়ে গেলেন । কলেজে পড়ার সময় জয়দেব দু'একবার মাত্র এসেছে আমাদের বাড়িতে, কিন্তু সেই জয়দেব আর এই জয়দেব তো এক নয় !

আজ জয়দেব একটু অতিরিক্ত সাজগোজ করে এসেছে, হাতঘড়িটা সোনা-সোনা দেখতে, চোখে সান গ্লাস, গায়ে সিল্কের শার্ট । সে ঘরে ঢোকামাত্র তার গা থেকে ভুর-ভুর করে বেরুতে লাগলো বিলিতি পারফিউমের গন্ধ ।

মা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি খেয়ে এসেছো ? একটু কিছু খেয়ে নেবে ?

জয়দেব বললো, আমার লাঞ্চ খাওয়া হয়ে গেছে সেই কখন ! নীলু এত দেরি করে খায় কেন ?

আমি বললুম, লাঞ্চ খেতে হয় ঠিক ঘড়ি দেখে, সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টার মধ্যে । আর আমরা যারা ছুটির দিনে দুপুরের খাওয়া খাই, আড়াইটে তিনটের

সময় খেলেও চলে !

—ছুটির দিন ? তুই কি কোথাও চাকরি পেয়েছিস নাকি ? এই যে সেদিন বললি, কোথাও বাঁধা কাজ-টাজ করিস না ?

মায়ের সামনে এই রকম প্রশ্ন কেউ করে ? মাথা-মোটা জয়দেবটার কোনোদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না !

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম, যেদিন আমি বাড়িতে থাকি, সেটাই আমার ছুটির দিন ।

আমার খাদ্যদ্রব্যের ওপর চোখ বুলিয়ে জয়দেব জিজ্ঞেস করলো, এটা কি লাউ চিংড়ি ? প্লেটে করে একটু দিন তো মাসিমা, অনেক দিন খাইনি ।

বাটিতে যতটা ছিল সবটাই একটা প্লেটে ঢেলে, সঙ্গে একটা চামচ দিয়ে মা তুলে দিলেন জয়দেবের হাতে । বাড়ির অন্য কারুর আর খাওয়া হবে না ।

জয়দেব চোখের নিমেষে সবটা শেষ করে ফেলে বললো, অপূর্ব ! অপূর্ব ! এত ভালো স্বাদ, মাসিমা আপনার হাতের রান্না নিশ্চয়ই । জানেন তো, কাজের চাপে প্রত্যেকদিনই হোটেল-রেস্টুরেন্টে খেতে হয়, বাড়িতে খাওয়ার চান্সই পাই না । এই তো কালই গ্রান্ডে ডিনার খেতে হলো এক পার্টির সঙ্গে, ওরা পারবে এমন লাউ-চিংড়ি রাঁধতে ?

মা একই সঙ্গে লজ্জিত ও বিগলিত হয়ে বললেন, শুধু একটুখানি তরকারি খেলে, আর একদিন এসো, ভালো করে খাওয়াবো ।

—আপনি তবু এই কথা বললেন, মাসিমা । গত শনিবার অজয়ের বাড়ি গিয়েছিলুম, অজয়ও আমাদের সঙ্গে পড়তো, নীলুর পাশেই বসতো, এখন সরকারী অফিসার হয়েছে, এর মধ্যেই একটা গাড়ি কিনেছে । কিন্তু কী চালিয়াত ! ওর সঙ্গে দু' ঘণ্টা ধরে কথা হলো, আমার জেনুইন খিদে পেয়েছিল, শুধু এক কাপ চা আর দু'খানা বিস্কুট ঠেকালো, আর কিছু না !

আমার গলায় ভাত আটকে যাবার মতন অবস্থা । মায়ের সামনে কী সব উদাহরণ তুলে ধরছে এই জয়দেবটা । আমারই সহপাঠীদের মধ্যে কেউ এরই মধ্যে গাড়ি কিনেছে, কেউ গ্র্যান্ড হোটеле ডিনার খায়... । এরপর মা আমার নাম করে যে কতবার দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন তার ঠিক নেই ।

এরকম ছেলেকে আর বেশিক্ষণ মায়ের সামনে বসিয়ে রাখা ঠিক নয়, আরও কত কী বলবে তার ঠিক নেই । তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে এসে বললুম, চল জয়দেব বেরুবি নাকি ? আমাকে একটু কাজে যেতে হবে ।

—কোথায় যাবি ?

একবার যখন রেডিও স্টেশনের নামটা ব্যবহার করতে শুরু করেছি, তখন

সারা মাস ধরে ওটাই চালাবো। এরপর খুঁজে পেতে রেডিওতে একটা চেনা লোক বার করতেই হবে।

—রেডিওতে একটা প্রোগ্রামের ব্যাপার আছে!

—চল, আমিও যাবো তোর সঙ্গে। আমি তোকে পৌঁছে দেবো।

বাড়ি থেকে বের করার পর জয়দেব আমাকে একটা সিগারেট দিল। মৌজ করে দুটান দেবার পর সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললো, রেডিও স্টেশনে তোকে কটার মধ্যে যেতে হবে? খুব তাড়াতাড়ি আছে?

—না। চারটে-পাঁচটার মধ্যে গেলেই হবে। ইন ফ্যাক্ট, রেকর্ডিং আজ হবে না। একটু অন্য কথাবার্তা বলার আছে, কাল গেলেও চলে।

—তবে তো ঠিকই আছে। আজই তোকে আমি পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে দিতে পারবো।

—তুই পৌঁছে দিতে যাবি কেন, আমি নিজে যেতে পারি না?

—তার আগে দু'এক ঘন্টা আমার সঙ্গে থাকবি, নীলু। একটু দরকার আছে রে?

—আজ তুই তোর সব সাইট দেখতে যাসনি?

জয়দেব কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রীতিমতন দুঃখ-দুঃখ গলায় বললো, অজয় আমার মনে একটা দাগা দিয়েছে।

আমার ধারণা ছিল, মেয়েরাই শুধু ছেলেদের মনে দাগা দেয়। জয়দেবের সবই উল্টো? অজয় ওর মনের মতন কোনো মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে? এর মধ্যে যেন একটা গল্পের গন্ধ পাচ্ছি!

—কী ব্যাপার, খুলে বল তো জয়দেব!

জয়দেব প্রথমে একটা লম্বা ভূমিকা করলো। কলেজের বন্ধুদের অনেকেরই খোঁজ-খবর রাখি না আমি, কিন্তু জয়দেব অনেকের ঠিকানা খুঁজে বার করে দেখা করতে যায়। বিশেষত যারা জীবনে উন্নতি করেছে, কিংবা কোনো ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, কিংবা ঘূসের চাকরি করে। জয়দেব তাদের কাছে গিয়ে তার বাড়ি বানাবার কন্ট্রাকটারির গল্প শুরু করে। এতে কেউ-কেউ নিজস্ব একখানা বাড়ি বানাবার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারে, কেউ-কেউ কোম্পানির বাড়ি বানাবার কন্ট্রাক্ট দিতে পারে। এই হচ্ছে জয়দেবের উদ্দেশ্য।

শ্যামল কাজ করে রাইটার্স বিল্ডিংসে, রঞ্জন পুলিশ অফিসার হয়েছে, কড়িয়া থানায় বসে, মলয় দুর্গাপুরের ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীতম খবরের কাগজের রিপোর্টার, অরুণাংশু অন্য দু'জনের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা শুরু করেছে ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রায় সবাই জয়দেবের বর্তমান চেহারা দেখে প্রথমে চিনতে পারে না।

তারপর চিনলে ভালো ব্যবহার করে, দু'জন সত্যি-সত্যি বাড়ি তৈরির কন্ট্রাক্টও দিয়েছে, আবার কেউ-কেউ ওকে পাতাই দেয়নি।

সবচেয়ে দুর্ব্যবহার করেছে অজয়। না, কোনো মেয়েঘটিত ব্যাপার নয়। জয়দেবের কাহিনী একেবারেই স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত।

অজয় ডবলু বি সি এস অফিসার হয়েছে বলে তার নাকি খুব অহংকার। সে জয়দেবের পেশার কথা শুনে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছে। নিজে সে একটা গাড়ি কিনেছে কিংবা স্বশ্রুরের কাছ থেকে পেয়েছে, তাই নিয়ে খুব চাল মারছিল। এমন কি দু'জনে একসঙ্গে বেরুবার পর জয়দেব জিজ্ঞেস করেছিল, তুই কোথায় যাবি ! অজয় বলেছিল, তুই কোন্ দিকে ? জয়দেবের যাবার কথা দেশপ্রিয় পার্কে, আর অজয় যাবে বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে। এমনই চশমখোর অজয় যে সে তার কলেজের বন্ধুকে নিজের গাড়িতে দেশপ্রিয় পার্কে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব জানালো না। আচ্ছা চলি, বলে জয়দেবের নাকের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল ?

জয়দেব চোয়াল কঠিন করে বললো, আমি অজয়ের ওপর প্রতিশোধ নেবো !

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুই মারবি নাকি অজয়কে ? তার জন্য তুই আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিস ? তুই একলাই তো পাঁচজনকে মারার পক্ষে যথেষ্ট !

জয়দেব বললো, আমি সহজে কারুর গায়ে হাত তুলি না। কলেজ-ফ্রেন্ডদের তো মারার প্রবন্ধই ওঠে না। আমি আজই একটা গাড়ি কিনবো। সেই গাড়ি নিয়ে অজয়ের নাকের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে আসবো !

—গাড়ি কিনবি ? আজই ?

—হ্যাঁ, এতদিন ইচ্ছে করলে কি আমি গাড়ি কিনতে পারতুম না ? আমার কাজ বেশির ভাগ মফস্বল শহরে, তাই ট্রেনে-ট্রেনেই ঘুরে বেড়াই, গাড়ির দরকার হয় না। এবারে গাড়ি কিনে গ্যারাজে ফেলে রাখবো তাও সই, তবু গাড়ি কিনতেই হবে ! তুই চল আমার সঙ্গে !

—গাড়ি কেনায় আমি কি সাহায্য করবো রে, জয়দেব ?

—তুই শুধু আমার সঙ্গে থাকবি। শোন, আমি সেদিন দেখেছি, অজয়ের গাড়িটা নতুন নয়, ডব্লু এম এ নাম্বার, সেকেন্ড হ্যান্ড নির্ঘাৎ। থার্ড হ্যান্ড বা ফোর্থ হ্যান্ড হতে পারে। আমিও একটা শস্তার গাড়ি কিনবো। গাড়ি একটা হলেই তো হলো ! আমি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের কাটিং নিয়ে এসেছি, সেই চার-পাঁচখানা গাড়ি দেখতে যাবো। আমি গাড়ি সম্পর্কে কিছু-কিছু বুঝি, অনেক ট্যাক্সি চেপেছি তো ! তোর নিশ্চয়ই গাড়ি সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই ?

আমি সবেগে দু'দিকে মাথা নেড়ে বললুম, না ! আমি ট্যাক্সি চাপার চান্সই পাই না ।

—তুই তবু বিজ্ঞের ভান করবি । একজনের বদলে দু'জন থাকলে কেসটা জোরালো হয় । তাতে দাম কমানোর সুবিধে ।

—একটা গাড়ির কত দাম হয় রে ?

—তা নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না ।

জয়দেব ঝট করে একটা ট্যাক্সি ডেকে ফেললো ।

প্রথমে আমরা গেলাম হরিশ মুখার্জি রোডের একটা গ্যারাজে । সেখানে তিনখানা পুরনো গাড়ি আছে বিক্রির জন্য । আমার তো মনে হলো তিনখানাই বেশ চমৎকার । বেশ চকচকে রং । তার মধ্যে সাদা রঙের গাড়িটা নিশ্চয়ই সবচেয়ে ভালো । আমি লক্ষ্য করেছি, বেশি বড়লোকরা সাদা গাড়ি চড়ে ।

মুখ খুলতে যাচ্ছিলাম, মনে পড়ে গেল, জয়দেব আমাকে বিজ্ঞ সেজে থাকতে বলেছে ।

গ্যারাজের মালিকটির মুখে ঝুঁকু দাড়ি । গায়ে খাকি জামা, কিন্তু বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ভাব আছে ।

ভুরু নাচিয়ে সে জয়দেবকে জিজ্ঞেস করলো, কত রেইঞ্জের মধ্যে চাইছেন ?

জয়দীপ বললো, ভালো গাড়ি দেখান, টাকার কোশ্চেন তো পরে !

লোকটি একটা কচি-কলাপাতা রঙের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে বললো, এটা নিয়ে যান, এ-গাড়ির মাইলেজ ভালো পাবেন । ইঞ্জিন কমিশন ফাইন ।

জয়দেব অবহেলার সঙ্গে সেই গাড়ির বনেটে একটা চাপড় মেরে বললো, এ তো অ্যাকসিডেন্টের গাড়ি, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ! কবার অ্যাকসিডেন্ট করেছে ?

খাকি-জামা একটু থতোমতো খেয়ে বললো, হ্যাঁ, মানে অ্যাকসিডেন্ট করেছে একবার, ঐ একবারই, তবে ইঞ্জিন ড্যামেজ হয়নি !

—ক'জন মারা গেসলো ?

—কী বলছেন মশাই, কেউ মারা যায়নি । তবে ড্রাইভারের একটু চোট লেগেছিল !

—এ রকম অপয়া গাড়ি আমি নিতে চাই না ।

—দাম কিন্তু শস্তার ওপরে আছে ।

—কত ?

আমি একটা নতুন জিনিস শিখলাম । সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনতে হলে প্রথমেই বনেটে চাপড় মেরে বলতে হয়, এটা অ্যাকসিডেন্টের গাড়ি ।

গাড়িটা দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তবু জয়দেব কী করে বললো ? আর

লোকটাও মেনে নিল সঙ্গে-সঙ্গে ?

দু'খানা গাড়ি নিয়ে কিছুক্ষণ দরাদরি করার পর জয়দেব বললো, নাঃ, পোষাচ্ছে না। আমরা আরও অন্য দু'একটা দেখে আসি, দরকার হলে আপনার কাছে ফিরে আসবো।

বাইরে বেরিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুই সাদা গাড়িটাকে একেবারে পাস্তাই দিলি না কেন রে ? দামও জিজ্ঞেস করলি না ?

—ওটার নাম্বার প্লেট লক্ষ্য করিসনি ? মডেলটা বেশি পুরনো নয়, দাম হাঁকতো অনেক !

গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখে যে তার মডেল বোঝা যায়, তাই-ই বা আমি জানবো কী করে ? শুধু অ্যাস্বাসেডর গাড়িরই তো কত রকম নাম্বার দেখি, তারও আবার বিভিন্ন রকম মডেল হয় নাকি ?

এরপর যাওয়া হলো, প্রতাপাদিত্য রোডের একটা গ্যারাজে। এখানে বিক্রির গাড়ি আছে একখানাই।

জয়দেব প্রথমেই নাম্বার প্লেট দেখলো। তারপর সে মুখ খোলার আগেই আমি বনেটের গায়ে চাপড় মেরেই উঃ বলে চৈঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম। চাপড়টা বেশ জোরেই হয়ে গেছে, আমার হাত জ্বালা করছে। কী রকম ভাবে চাপড় মারতে হয়, সেটাও দেখা দরকার।

যাই হোক, অতি কষ্টে উঃ দমন করে বললুম, এটা তো অ্যাকসিডেন্টের গাড়ি, দেখেই বোঝা যাচ্ছে !

এই গ্যারাজের মালিকের চেহারা নিরীহ, চোখে চশমা, সেই চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে একখানা শেল দৃষ্টি হেনে সে বললো, কলকাতা শহরে এমন একখানাও গাড়ি বার করুন তো, যেটা কোনো না কোনো অ্যাকসিডেন্ট করেনি ? সে রকম একখানা বার করতে পারবেন ?

বাবাঃ, এ যে গৌতম বুদ্ধের মতন প্রশ্ন। এমন একখানা বাড়ি থেকে এক দানা শর্ষে এনে দিতে হবে, যে বাড়িতে কখনো কোনো শোকের কারণ ঘটেনি। কলকাতার বাড়ির মতন গাড়িরও সেই অবস্থা !

জয়দেব বললো, এ গাড়ির কন্ডিশনটা এমনিতেই ভালোই মনে হচ্ছে। কী রকম তেল খায় ?

লোকটি পাস্টা প্রশ্ন করলো, কী করে বুঝলেন কন্ডিশন ভালো ? বাইরেটা দেখে গাড়ির কিছু বোঝা যায় ? এই জন্যই তো অধিকাংশ লোক ঠকে।

এ লোকটি সত্যি অন্য টাইপের। এর কাছে মুখ খুলে লাভ নেই। আমি জয়দেবের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার কেন যেন ধারণা হলো, এই লোকটা

আমাকে অপমান করার জন্য বন্ধপরিষদ । যা যায় জয়দেবের ওপর দিয়ে যাক !
লোকটি চিবোনো গলায় জয়দেবকে প্রণাম করলো, আপনি সত্যি-সত্যি গাড়ি
কিনবেন ?

জয়দেব ধমকের সুরে উত্তর দিল, সত্যি নাকি মিথ্যে-মিথ্যে আমরা আপনার
কাছে ট্যাক্সি চেপে এসেছি ?

—আজই কিনবেন ?

—আজই !

—ক্যাশ ডাউন ?

—ক্যাশ ডাউন ! গাড়ি পছন্দ হলে এখান থেকেই ডেলিভারি নিয়ে যাবো ।

লোকটি বললো, শুনুন তা হলে । এমনি-এমনি দেখে গাড়ি চেনা যায় না ।
গাড়ি চালিয়ে দেখতে হয় । রানিং গাড়ির সাউন্ড শুনতে হয় । পিক আপ দেখতে
হয় । ক্লাচ, গীয়ার, অ্যাকসিলারেটর...গাড়ি কি দর্শনধারী জিনিস, গাড়ি হচ্ছে
চালাবার জিনিস !

জয়দেব গম্ভীরভাবে বললো, তা হলে চালিয়ে দ্যাখান একটু ?

—এই গ্যারাজের মধ্যে কী বুঝবেন ? গাড়িতে পাঁচ লিটার তেল ঢালুন ।
তারপর কলকাতার রাস্তায় এক-দেড় ঘণ্টা ঘুরে আসুন । তারপর অন্য কথা
হবে ।

—দর কত পড়বে, সেটা আগে বলবেন না ?

—আমি অনেখ্য দাম নিই না । গাড়ির কিছু দোষ থাকলে নিজে বলে দেবো,
যেমন আগেই বলে রাখছি, দু'খানা চাকা আপনাকে নতুন কিনতে হবে । যান
ঘুরে আসুন ।

—কে চালাবে ? আমি অবশ্য চালাতে জানি, কিন্তু, মানে—

—আমার একজন ড্রাইভার সঙ্গে দিচ্ছি । কিন্তু আপনাকে দু' হাজার টাকা
জমা রাখতে হবে । আমি রসিদ দিচ্ছি, গাড়ি ফেরত আসার পর, আপনি এ-গাড়ি
কিনুন বা না কিনুন, দরে পোষাক বা না পোষাক, ও-টাকা আপনি ফেরত পাবেন,
এক পয়সা কাটবো না !

এই চশমা-ধারীর ব্যক্তিত্বের কাছে জয়দেবও হার মেনে গেল । মুখে আর
কোনো কথা জোগালো না । আমারও মনে হলো, লোকটি মন্দ বলেনি, আগে
কিছুক্ষণ গাড়ি চড়ে ঘুরে তো আসা যাক ! এমন কি...

দু' হাজার টাকা জমা রেখে, রসিদ নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল । ড্রাইভারটি
একটি রোগা-পাতলা আঠেরো-উনিশ বছরের ছেলে, গায়ে শুধু একটা ময়লা
গেঞ্জি । মনে হয় সে ড্রাইভার নয়, মেকানিক ।

খানিক দূর যাবার পরই স্টিয়ারিং-এর তলায় ডান্ডাটায় একটা মড়মড় শব্দ হলো ।

জয়দেব বললো, ওকি ওকি ?

ছেলেটি বললো, গীয়ারে একটু সাউন্ড আছে, স্যার । কিছু কাজ করাতে হবে, সে খরচটা আপনি দাম থেকে বাদ দেবেন ।

—কত খরচা পড়বে গীয়ারের কাজ করাতে ?

—বড় জোর শ' দুয়েক ।

—আর কিসে কিসে গুণগোল আছে বলো তো ভাই । তোমাকে আমি একশো টাকা দেবো ।

—আর সে রকম কিছু গুণগোল নেই স্যার ।

—গাড়িটা এত দুলছে কেন ?

—স্প্রিং একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে, স্যার ।

আর শক অ্যাবজরভার বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমারও কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত । তাই আমি ভারিক্‌ি ভাবে বললুম, এ গাড়ির পেছন দিয়ে ধোঁয়া বেরোয় তো ?

ছেলেটি অবাক ভাবে মুখ ঘুরিয়ে বললো, না স্যার ! ধোঁয়া বেরুবে কেন ? মোবিল খায় না । ইঞ্জিন কন্ডিশন বেশ ভালো আছে ।

আমি একটু হতাশ ভাবে তাকালুম জয়দেবের দিকে । গাড়ি থেকে যদি ধোঁয়াই না বেরোয়, তা হলে অজয়ের নাকের ওপর ধোঁয়া ছাড়া হবে কী করে ?

জয়দেব ফিসফিস করে বললো, ইচ্ছে করলে ইঞ্জিন ভালো থাকলেও ধোঁয়া ছাড়া যায় !

গাড়ি ছুটছে ময়দানের দিকে । একটু বেশি লাফাচ্ছে এই যা, আর তেমন দোষ পাওয়া যাচ্ছে না । কলকাতার রাস্তায় সব গাড়িই লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে ।

আমি জয়দেবকে জিজ্ঞেস করলুম, অজয় আজকাল কোন পাড়ায় থাকে রে ?

জয়দেব ঠিক আমার মনের কথা বুঝেছে । আজ শনিবার, অজয়ের এখন বাড়ি থাকার সম্ভাবনা আছে । অজয়ের নাকের ওপর ধোঁয়া ছাড়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হলে আর গাড়িটা কেনার দরকার কী ? আজই তো সেই কাজ সেয়ে ফেলা যায় । আমি অজয়কে ডেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে গাড়িটার পেছনে এনে দাঁড় করাবো, জয়দেব ধোঁয়া ছেড়ে দেবে ।

জয়দেব আমার দিকে চোখ টিপে বললো, আমিও ঠিক এই কথাই ভাবছিলুম, তাতে আমাতে খুব মনের মিল রে, নীলু !

ড্রাইভারের কাঁধে টাকা মেরে সে বললো, এই যে ভাই, একটু বেকবগানের

দিকে চলো তো !

ছেলেটি অবাক হয়ে বললো, স্যার, ময়দানের মধ্যেই তো ভালো টেস্টিং হবে ।

—না, আমি ভিড়ের রাস্তায় চালিয়ে দেখতে চাই । চলো বেকবাগান ।

ময়দান ছেড়ে গাড়িটা থিয়েটার রোডে ঢুকলো । তারপর আর বেশি দূর এগোতে পারলো না । ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ করতে লাগলো, তারপর থ-র-র-র থ-র-র-র, তারপর একেবারে চুপ ।

জয়দেব জিজ্ঞেস করলো, এটা কী ব্যাপার হলো ?

ছেলেটি বললো, মনে হচ্ছে, কারবুরেটারে ময়লা এসে গেছে, এম্ফুনি ঠিক হয়ে যাবে !

জিজ্ঞেস করলুম, কারবুরেটার জিনিসটা কোথায় থাকে ।

সে হাত দিয়ে বনেটটা দেখিয়ে দিল ।

আমি বললুম, ও জায়গাটা তো দিব্যি ঢাকা রয়েছে, ওখানে ধুলো-ময়লা আসবে কী করে ?

ছেলেটি নেমে গিয়ে বনেটটা খুললো । কী সব নাড়া-চাড়া করতে লাগলো । ফিরে এসে আবার স্টার্ট দেবার চেষ্টা করলো, গাড়ি আর কোনো শব্দই করলো না ।

ছেলেটি জয়দেবের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বললো, কেন এ রাস্তায় ঢুকতে বললেন ? এ-গাড়ি ময়দানেই ভালো চলে ।

জয়দেব আঁতকে উঠে বললো, তার মানে ? গাড়ি কিনে আমি কি সারাজীবন ময়দানেই ঘুরবো নাকি ! বাড়ি যেতে পারবো না !

—তেল ওভার ফ্লো করছে স্যার ! একটু ঠেললে ঠিক হয়ে যাবে মনে হচ্ছে । দু'হাত ঠেলে দিন না !

ছেলেটি ঠেলবে না । তাকে স্টিয়ারিং হুইলে বসে স্টার্ট নেবার চেষ্টা করতে হবে । ঠেলতে হবে জয়দেবকে আর আমাকে ।

অগত্যা নেমে হাত লাগাতে হলো । এ-গাড়িখানা যেন অতিরিক্ত ভারী । পাঁচ মিনিটেই গলদঘর্ম অবস্থা । জয়দেবের গায়ে অনেক জোর, তা ছাড়া, এ-গাড়ির জন্য সে এর মধ্যেই দু' হাজার টাকা জমা দিয়ে এসেছে, তার উদ্যম বেশি হতেই পারে, কিন্তু আমি অতটা পারবো কেন ?

জয়দেব বললো, তোকে খামোকা খাটাচ্ছি, নীলু ! ঠিক আছে, রাস্তিরে তোকে জিমিস কিচেনে খাওয়াবো ।

তারপর সে হেঁকে বললো, কই হে ! আর কত ঠেলতে হবে ?

—আর একটুখানি, স্যার !

ক্যামাক স্ট্রিটের মোড় পার হয়ে গেলুম, তবু গাড়ির আর পুনর্জীবনের লক্ষণ নেই।

জয়দেব বললো, আমার প্রেস্টিজ কী রকম পাংকচার করে দিল, বল ত্রেনীলু ! হয়তো আমার কত ক্লায়েন্ট আমাকে গাড়ি ঠেলতে দেখে ফেলছে।

আমি বললুম, হয়তো তারা ভাববে, গাড়িটা আমার, তোকে আমি ঠেলার জন্য ভাড়া করেছি !

—তার মানে ! কী করে লোকে তোকে গাড়ির মালিক ভাববে ?

—আমার কপালে ঘাম জমে গেছে। তুই একটুও হাঁপাসনি। গাড়ির মালিকদের কি এতখানি গাড়ি ঠেলার অভ্যেস থাকে ?

জয়দেব রেগে গিয়ে বললো, এটা একটা পচা, লবঝড়ে গাড়ি। এটার ইঞ্জিন বলতে কিছুই নেই। এ-গাড়ি কেনার চেয়ে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরা অনেক ভালো।

—আমার ধারণা কি জানিস, এ-গাড়িটার দাম দু' হাজারের থেকেও কম। কিংবা কারুকে বিনা পয়সায় দিতে চাইলেও এ-গাড়ি নেবে না। তোর ঐ টাকাটাই গেল !

—আমার টাকা যাবে ! ঐ চশমা-পরা বুড়োটা তা হলে এখনো জয়দেব সাহাকে চেনেনি। গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করবো !

—তা হলে আর ঠেলে লাভ কী ?

জয়দেব ঠেলা থামিয়ে ড্রাইভারের কাছে গিয়ে বললো, তুমি কী ভেবেছো, বলো তো হে ? এ-গাড়ি আর স্টার্ট নেবে কোনো দিন ?

—বোধহয় তেল ফুরিয়ে গেছে।

—এই বললে তেল ওভার ফ্লো করছে, এখন বলছো তেল ফুরিয়ে গেছে ?

—কী করবো স্যার, আপনি কেন এই রাস্তায় ঢুকতে বললেন !

—চোপ ! কেন, এ-রাস্তায় আর অন্য গাড়ি চলছে না ?

—বললুম তো, এ-গাড়ি ময়দানে ভালো চলে। আর পাঁচ মিনিট ঠেলুন, তাতে গাড়ি গরম হয়ে যাবে।

—ঠিক পাঁচ মিনিট !

কলামন্দিরও ছাড়িয়ে প্রায় সার্কুলার রোডের মুখটায় এসে আমি বললুম, ওরে জয়দেব, এবারে আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো !

—ঠিক বলেছিস ! পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট হয়ে গেছে। আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলুম !

—অন্য কথা ভাবতে-ভাবতে তোর গাড়ি ঠেলতে কষ্ট হয় না, কিন্তু আমার যে বুক হাঁপ ধরে গেল !

—এবারে লোক ডেকে ঠেলাতে হবে ।

—তা হলে আর এদিকে গিয়ে কী লাভ ? তুই এই অবস্থায় গাড়িটা অজয়ের বাড়ির সামনে নিয়ে যেতে চাস ?

—মাথা খারাপ ! এ-গাড়ি গ্যারাজে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আগে আমার দু' হাজার টাকা আদায় করতে হবে ।

—দেবে টাকাটা ?

—দেবে না মানে ? ওর বাপ দেবে ! চোদ্দ পুরুষ দেবে ! জয়দেব সাহার টাকা মারতে পারে এমন কোনো বাপের ব্যাটা নেই !

দুম-দাম করে এগিয়ে গিয়ে সে ড্রাইভারের দিকে দরজা খুলে চোখ পাকিয়ে বললো, নাম, তুই এবারে নেমে গাড়ি ঠ্যাল, ব্যাটা শয়তানের সাগরেদ ! আমায় এখনও চিনিসনি ?

ছেলেটি বিনা আপত্তিতে নেমে দাঁড়িয়ে বললো, আমি একলা পারবো না, স্যার ! আরও লোক জোগাড় করতে হবে ।

—জোগাড় কর !

জয়দেব নিজে স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসলো । যে-গাড়ি অন্য লোক ঠেলবে, সে-গাড়ি চালানোয় বোধহয় খুব একটা কৃতিত্ব লাগে না ।

আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললুম, তা হলে আমি এখন কী করবো, জয়দেব ? তোর সঙ্গে যাবো ?

আমাকে গাড়ির মধ্যে বসাবে, না ঠেলাওয়ালাদের দলে ফেলবে, সে বিষয়ে মনঃস্থির করতে না পেরে সে বললো, নাঃ, তুই আর গিয়ে কী করবি ? তোর অনেক পরিশ্রম গেছে, এবারে বিশ্রাম নে । তুই ট্রামে করে ফিরে যা । তোর কাছে ট্রাম ভাড়া আছে ?

—আছে । টাকাটা উদ্ধার করতে পারলি কি না পরে একদিন খবর দিস !

কলকাতা শহরে গাড়ি-ঠেলার লোকের অভাব হয় না । দেখতে-দেখতে গোটা তিনেক নেংটি-নেংটি ছেলে জুটে গেল তারা হৈ-হৈ করে গাড়িটা ঠেলে নিয়ে চললো, একটু বাদে বাঁক ঘুরে গেল ।

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম রাস্তার মোড়ে । সঙ্গে হয়ে এসেছে । এতখানি পরিশ্রমে ঘামে ভিজে গেছে জামা । চায়ের তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু এ-পাড়ায় সব দামী-দামী দোকান, পাশাপাশি দু'তিনটে বার, এখানে আমার চা খাওয়ার আশা নেই ।

একটু জিরিয়ে নেবার জন্য একটা সিগারেট ধরালুম। এ-পাড়ায় আমার খুব কমই আসা হয়। পেট্রোল পাম্পটার ওপাশের ঐ বড় বাড়িটার নাম হিরনানি ম্যানসান না? খবরের কাগজে ঐ বাড়িটার নাম প্রায়ই দেখি।

একটু পরেই রাস্তার ওপারের একটা গোলমালের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো।

পেট্রোল পাম্পটার কাছে একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে, তার থেকে দু'জন যাত্রী নেমে ড্রাইভারের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। লোক দুটির কণ্ঠস্বর জড়ানো, শনিবারের সন্ধ্যাবেলায় মাতালের কারবার। গাড়ির মধ্যে আরও দু'জন বসে আছে, তাদের একজনের মাথা এলানো, মনে হয় অসুস্থ।

ঝগড়াটা একটু বাদেই থেমে গেল, অন্য লোক দুটিও নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। তাদের একজনকে আর দু'জন দু' কাঁধ ধরে-ধরে নিয়ে চললো।

এটা এমন কিছু একটা দেখার মতন দৃশ্য নয়। আমি মুখটা ফিরিয়ে নিতে গিয়েও মাথার মধ্যে যেন একটা হোঁচট খেলুম। একেবারে আউট হয়ে যাওয়া লোকটা কে? চেনা-চেনা লাগছে।

দ্রুত রাস্তা পার হয়ে সেই দঙ্গলটার পাশে এসে পড়তে সময় লাগলো না একটুও। বুকটা কেঁপে উঠলো। অসুস্থ লোকটি রাজা সরকার! তার সঙ্গীরা প্রত্যেকে প্রচণ্ড মাতাল!

জয়দেবের যদি গাড়ি কেনার হুজুগ না হতো, সেই গাড়ি যদি ময়দান ছেড়ে থিয়েটার বোডে না ঢুকতো, এবং এতক্ষণ ধরে আমাদের ঠেলতে না হতো, তা হলে আজ সন্ধ্যাবেলা এই মুহূর্তে এই জায়গাটায় আমার উপস্থিত থাকার কোনো প্রশ্নই ছিল না। তা হলে রাজা সরকারকেও আমি এমন অবস্থায় দেখতে পেতাম না।

ভালো চাকরি যারা করে, তারা টাই পরে অফিস যায়, তারা সাহেব। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অফিসার, কোনো-কোনো সংরক্ষিত প্রাণীর মতন, একেবারে অবলুপ্তির পথে। সাহেব-সাজা অফিসারদের সাহেবী কায়দায় মাঝে-মাঝে মদ খেতেই হয়। দু'একদিন মাতাল হয়ে যাওয়াও দোষের কিছু নয়। শরৎচন্দ্রই তো বলেছেন, যে মদ খায় অথচ কক্ষনো মাতাল হয় না, সে অতি সাঙ্ঘাতিক মানুষ।

কিন্তু বিয়ের মাত্র কয়েকদিন আগে, সন্ধ্যাবেলাতেই এরকম বেসামাল অবস্থা?

সঙ্গের লোকগুলো কেউই রাজা সরকারের মতন একেবারে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেনি। হয়তো রাজা সরকারের দোষ নেই, ঐ লোকগুলো জোর করে ওকে বেশি খাইয়ে দিয়েছে। এখন ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে ওরা কোথায় নিয়ে

যাচ্ছে রাজাকে ?

এই দৃশ্য উপেক্ষা করে আমার পক্ষে চলে যাওয়া অসম্ভব ।

আমি ওদের পাশাপাশি হাঁটতে লাগলুম । যেমন রাস্তা দিয়ে অনেক লোক যাচ্ছে । অন্য তিনজন লোককে আমি কস্মিনকালেও দেখিনি, তবে সাজ-পোশাকে বেশ অর্থবান বলে মনে হয় ।

রাজা সম্পূর্ণ চৈতন্য হারায়নি । তার পায়ে জোর নেই বটে কিন্তু মাঝে-মাঝে তার সঙ্গীদের সঙ্গে অর্ধক্ষুণ্ণভাবে কী যেন বলছে । একবার হেসেও উঠলো ! সুতরাং এই লোকগুলো রাজাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না ! বন্ধ মাতালদেরও কয়েকটা ব্যাপারে টনটনে জ্ঞান থাকে ।

পেট্রোল পাম্পটা পার হয়ে ওরা এগোলো হিরনানি ম্যানস্যানের দিকে । হয়তো ঐ লোকগুলোর কেউ একজন থাকে সেখানে । এটা ঠিক, রাজার এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার । এই অবস্থায় বাড়ি ফেরাও তো অনুচিত । রিটার্ডাইড আই এ এস অফিসার কি ছেলের এই দশা থেকে খুশি হবেন ? হাসির বড় মাসির বাড়িও খুব কাছে । বিয়ের আগেই দু' বাড়িতে যথেষ্ট যাতায়াত আছে, হাসিদের বাড়ির কেউ এখন রাজাদের বাড়িতে বসে থাকতে পারে ।

ওরা হিরনানি ম্যানসনের গেট দিয়ে ঢুকে লিফটের কাছে দাঁড়ালো ।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো, বিহারের একজন এম পি এই কাছাকাছি একটা বাড়িতে ধরা পড়েছিল না কিছুদিন আগে ? তাই নিয়ে খবরের কাগজে কত তোলপাড় ! রীতিমতন কেলেকারি ! রাজার পক্ষে এখন এই সব জায়গার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাই ভালো নয় ?

কী করবো কিছুই বুঝতে পারছি না । রাজার বন্ধুরা কেউ আমাকে চেনে না । এই অবস্থায় রাজাও আমাকে চিনতে পারবে কি না খুব সন্দেহ আছে । আমি কিছু বলতে গেলেই বা ওরা পান্ডা দেবে কেন ?

লিফট নামতেই ওরা একে-একে ঢুকলো । তারপর দরজা বন্ধ হবার আগেই আমি বিদ্যুতের মতন ছুটে গেলাম তার মধ্যে । কোনো লিফটম্যান নেই । লিফটের গায়ে নানা রকম নোটিশ সাঁটা । আমি মুখ ফিরিয়ে পড়তে লাগলুম সেগুলো ।

ওরা নামলো থার্ড ফ্লোরে, আমি উঠে গেলুম চারতলায় । সঙ্গে-সঙ্গে আবার নেমে এসে দেখি, ওরা ফ্ল্যাট নম্বার থ্রি—এ'র সামনে দাঁড়িয়ে । আমাকে নিচে নেমে যেতে হলো ।

অসম্ভব একটা উত্তেজনা হচ্ছে শরীরে । গোয়েন্দাগিরি করার তো অভ্যাস নেই । এরপর কী করতে হয় ?

লেটার বক্স ! ফ্ল্যাট নম্বর থ্রি এ-তে কে থাকে ?

এ-বাড়িতে অসংখ্য লেটার বক্স, দেয়ালে ঝুল-কালি মাখা । এত বড় বাড়ির যেন কোনো মা-বাপ নেই । কোনো বাস্তবের ওপরটা ভাঙা ।

অনেক খুঁজে থ্রি-এ পাওয়া গেল, তার ওপরে কোনো ব্যক্তির নাম লেখা নেই, একটা কোম্পানির নাম লেখা । ফ্রি এন্টারপ্রাইজ ! শনিবার সন্দের পর ফ্রি এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে রাজা সরকারের কী কাজ থাকতে পারে ?

কোনো দারোয়ান শ্রেণীর লোক থাকলেও তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলা যেত । কেউ নেই । এ বাড়ি যেন একটা হাট । লোকজন আসছে-যাচ্ছে, কেউ-কেউ লিফটের দরজাটা এমন জোরে টানছে যেন ওটা ভাঙতে পারলেই তার আনন্দ ।

এখন ফিরে যাবো ? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পুরো একটা সিগারেট শেষ করেও কোনো বুদ্ধি এলো না । এ-পাড়ায় আমার চেনা একজনও নেই যে তার কাছে বুদ্ধি নিতে যাবো ।

একমাত্র একটা কাজ করা যায় । ফ্রি এন্টারপ্রাইজ ব্যাপারটা কী সেটা অস্তুত জেনে নেওয়া যাক । কোম্পানির নাম লিখে রেখেছে যখন, তখন যে-কেউ গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে পারে ।

আবার লিফটে চেপে আমি তিনতলায় নেমে থ্রি-এ'র সামনে দাঁড়ালুম । ভেতরে জোর কথাবার্তা চলছে । পাঁচ লাখ টাকা...ছইশ্চি...কনসাইনমেন্ট...নাইলন টায়ার...বরফ নেই, বরফ ?এই শেফালী, এদিকে এসো... আমরা গাড়ি দেবো.... হ্যাঁ.... লন্ডনে....আর একটু নাও....

এইসব টুকরো-টুকরো কথা ভেসে আসছে । অন্য একটা ফ্ল্যাটে কে যেন চৈঁচিয়ে গান গাইছে....করিডোর দিয়ে হেঁটে আসছে দু'জন লোক, লিফটের সামনে দাঁড়ালো, আমার দিকে একবার দেখলো.... । এভাবে একটা বন্ধ দরজার সামনে আমার দাঁড়িয়ে থাকা চলে না ।

সাহস করে আমি দরজায় দু'বার ঠক-ঠক করলুম ।

লোক দুটি লিফটে নেমে গেল । এই ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে গেল সঙ্গে-সঙ্গে । শালোয়ার-কামিজ পরা একটি যুবতী, বুকের সামনেটা অনেকটা খোলা, চোখদুটো চকচকে, ঠোঁট ভিজ্জে-ভিজ্জে, মাথার চুলে ফুল গৌজা, হিন্দী সিনেমার নায়িকার মতন....

মেয়েটি আমাকে দেখে খানিকটা অবাক ও বিরক্ত হয়ে বললো, ও, আমি ভাবলুম বরফ এনেছে বুঝি ! তোমাকে কে পাঠিয়েছে ?

আমি নিরুত্তর ।

—কে ? কী চাই তোমার ?

আমি ভেতরের দৃশ্যটা যেন গিলছি। কার্পেট-পাতা মেঝেতে গোল হয়ে বসেছে সেই লোকগুলো, মাঝখানে বোতল, কলের জল...রাজা বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, তার হাতে ভর্তি গেলাস, যে-মেয়েটি দরজা খুলেছে, সে ছাড়াও ঐ রকমই সাজে আরও দুটি মেয়ে বসে আছে সেখানে। এই তা হলে ফ্রি এন্টারপ্রাইজ ?

আমি কোনো কথা ঝুঁজে পাচ্ছি না দেখে দরজার মেয়েটি রেগে গিয়ে বললো, এখন এখানে কিছু হবে না, হবে না, যাও !

বাপাস করে সে দরজা বন্ধ করে দিল আমার মুখের ওপর।

ঐ রকম ভাবে দরজা বন্ধ করে দিয়েই সে বাঁচিয়ে দিল আমাকে। আর কয়েকটা মুহূর্ত দেরি হলেই আমি ধরা পড়ে যেতাম।

বন্ধ দরজার থেকে মুখ ফেরাতেই দেখলুম, লিফট এসে থেমেছে। তার থেকে নেমে আসছে চারজন সশস্ত্র পুলিশ।

॥ ৭ ॥

রাস্তিরবেলা বাড়ি ফিরতেই মা বললেন, তুই কোথায় থাকিস ? একজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা এসেছিল তোকে ঝুঁজতে, অনেকক্ষণ বসে ছিল, এই তো একটু আগে গেল। কী সুন্দর কথা বলে। ভারী ভালো লাগলো।

—কারা, কী নাম ?

—চন্দন দত্ত আর উজ্জয়িনী। এর মধ্যে উজ্জয়িনী তো মাসিমা বলে ডেকে ফেলল আমায়, দু'বার চা খেল, আমাকে নেমস্তন্ন করলো শান্তিনিকেতনে যেতে।

আমার এক মাসতুতো ভাইকে জপিয়ে অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে তার হাত দিয়ে চন্দনদার পাজামা-পাঞ্জাবি ফেরত পাঠিয়েছিলুম। আমি আর ওদের বড়দির বাড়িতে যেতে চাইনি। কিন্তু চন্দনদা রেডিও-র ব্যাপারটা ভোলেননি। চন্দনদা আমার মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করেছেন অনেকক্ষণ, তার হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন একটা। এবারে সস্ত্রীক এসে হাজির হয়েছেন আমার বাড়িতে।

এবারে মাস দু'একের জন্য কোথাও উধাও হয়ে যেতে হবে। দিকশূন্যপুরে চলে যাবো, অনেকদিন বন্দনাতির খবর নেওয়া হয়নি।

মা বললেন, ছেলেটি একটা লেখা রেখে গেছে তোর পড়বার জন্য। আর একটা নেমস্তন্নর চিঠি।

—নেমস্তন্নর....

—হ্যাঁ, বিয়ের চিঠি । বারবার বলেছে, তোকে যেতেই হবে । আমি যেন অবশ্যই পাঠাই তোকে....এর মধ্যে ওরা আর একবার আসবে বলেছে । হ্যাঁ রে, ওদের সঙ্গে তোর কী করে ভাব হলো রে ।

হাসির বিয়ের নেমন্তন্ন, আমাকে !

কিন্তু হাসির বিয়ে শেষ পর্যন্ত হবে কি ? পুলিশ এসেছিল ঐ থ্রি-এ ফ্ল্যাটটা রেইড করতে । পুলিশের ভাব-ভঙ্গি এমনই নিশ্চিত ছিল, যেন তারা আগে থেকেই কোনো খবর পেয়ে এসেছে ।

বিহারের সেই এম পি....কালকের কাগজে ছাপা হবে খবর....কাগজের লোকেরা কি পুলিশের পেছনে ওত পেতে থাকে । এত তাড়াতাড়ি তারা সব খবর পেয়ে যায় কী করে ? কেন রাজা ওখানে গেল ?

রাজা, রাজা, তুমি কেন পবিত্র; সুন্দর, খামখেয়ালী একটি মেয়ের এই ক্ষতি করলে ?

জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে হাসি বৃষ্টির জল নিয়ে চোখে লাগাচ্ছিল...হাসি চেয়েছিল অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে খোয়াই-এর ধারে যেতে...গাছের ওপর একটা ময়ূরের পালক...চৌরঙ্গিতে সব গাড়ি-যোড়া থামিয়ে রাস্তার মাঝখানে নাচতে চেয়েছিল হাসি...সেই হাসি কি এতবড় একটা আঘাত পারার যোগ্য ? ওর স্বপ্ন ভেঙে যাবে...এই রকম মেয়েরা স্বপ্নের মধ্যেই বাস করে, স্বপ্ন ভেঙে গেলে কি আর মুখ-চোখের ঐ দীপ্তি থাকবে ?

পুলিশ দেখে আমি ভয়ে পালিয়ে এসেছি । আমি থাকলেই বা কী করতে পারতাম । কেন যেন মনে হচ্ছে, রাজার ঐ দলের মধ্যেই কারুর উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে ঐ রকম ভাবে ফাঁদে ফেলার । রাজাই বা বোকার মতন সেই ফাঁদে কেন পা দিল, নিশ্চয়ই মদ কিংবা পণ্যা স্ত্রীলোকের লোভে নয় !

ভাত খেতে-খেতে বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা কথা মনে পড়ে গেল । দুপুরবেলা জয়দেব বলছিল, আমাদের কলেজের বন্ধুর এখন কে কোথায় কাজ করে । তার মধ্যে রণেন, রণেন আছে পুলিশে, কড়িয়া থানায়... । রণেন এক সময় আমার খুব বন্ধু ছিল । এক সঙ্গে চাইবাসায় বেড়াতে গিয়েছিলুম...একবার পরীক্ষার সময় রণেন প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিল, ওর টুকরো-টুকরো কাগজের একদলা চালান করে দিয়েছিল আমার হাতে, ইনভিজিলেটরকে দেখে সেই কাগজ আমি টপ করে গিলে ফেলেছিলুম...সেসব কথা কি রণেনের মনে পড়বে না ? মাত্র সাত-আট বছর আগেকার ব্যাপার !

যদি কিছু করতে হয়, আজ রাগ্তিরেই করা দরকার ।

একসময় ভাবলুম, ভোরবেলাই দিকশূন্যপুরে পালাবো, এসব ঝামেলার মধ্যে

আমি থাকতে চাই না। ওখানে গেলে হাসির কথা, চন্দনদা-উজ্জয়িনীর কথা আমার মন থেকে মুছে যাবে....

কিন্তু হাসির মুখটা মনে পড়তেই আমার বুকটা মুচড়ে উঠছে। এই রাতটা কাটবে কী করে ?

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর চুপি-চুপি নিচে নেমে টুক করে দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়লুম। কড়েয়া থানাটা আবার কোথায় তা কে জানে ! এর আগে কোনো থানার খোঁজ-খবর রাখার প্রয়োজন হয়নি।

এত রাতে ট্যাক্সি ছাড়া গতি নেই। ট্যাক্সিওয়ালারা নিশ্চয়ই সব থানা চেনে। আমার পুঁজি ছিল পনেরো টাকা, সব নিয়ে এসেছি।

একটা ট্যাক্সি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশে গিয়ে আমি কিছু বলবার আগেই ড্রাইভারটি বললো, হাওড়া ? হাওড়া গেলে নিয়ে যেতে পারি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কড়েয়া কি হাওড়ার দিকে ? কিংবা হাওড়া কি কড়েয়ার আগে ?

লোকটি বললো, হাওড়ার সঙ্গে কড়েয়ার কোনো সম্পর্কই নেই, দাদা !

—আমার সঙ্গে আছে। আমি কড়েয়াতেই যেতে চাই। শুধু কড়েয়া গেলেই চলবে না, কড়েয়া থানার মধ্যে।

—আপনি থানায় যাবেন, এত রাতে ? কেন, বাড়িতে কোনো খুন-তুন হয়েছে ?

—ভবানীপুরে খুন হলে তুমি কড়েয়া থানায় যেতে কি ?

—তা হলে ?

গোঁফের অভাবে একটা জুলপি চুলকে বললুম, আমি কড়েয়া থানায় কাজ করি, সেখানে যাবার বদলে আমার কি হাওড়া গেলে চলবে, বলুন ?

লোকটি বিরক্ত ভাবে একটা দরজা খুলে দিয়ে বললো, উঠুন। আপনারা পুলিশের লোকেরা মাইরি রাস্তার দিকে বড্ড বামেলা করেন !

আমি ভেতরে ঢুকে গ্যাট হয়ে বললুম, আর দিনের বেলা যে কিছু বলি না ! সারাদিন ধরে কত জেনুইন প্যাসেঞ্জারদের রিফিউজ করে যে শুধু শেয়ারের ট্যাক্সি হিসেবে খাটেন, তখন কি ডিসটার্ব করি ? এখন এত রাতে শেয়ার পাবেন ?

—আমার হাওড়ার দিকে যাবার দরকার ছিল।

—ভাড়া দেবো আমি আর দরকারটা থাকবে আপনার ? বাঃ দাদা, বেশ ! আমি হাওড়ার দিকেই গেলে আপনি আমায় বিনা পয়সায় নিয়ে যেতেন ?

—সে কথা হচ্ছে না।

—কোনো কথায়ই আর দরকার নেই। সোজা কড়েরা থানায় !

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটো, কিন্তু থানার মধ্যে বেশ একটা কর্মচঞ্চল্য আছে। দু'তিনজন লোক ভাঁড়ের চা খেতে-খেতে গল্প করছে কম্পাউন্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে। উজ্জ্বল আলো, কয়েকটা রিক্সা, লোকজনের গলার আওয়াজ।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিতে-দিতে একবার আমার সন্দেহ হলো, রণেনটা কী চাকরি করে, কনস্টেবল না তো ! আজকাল অনেক কনস্টেবল দেখতে পাই !

তার পরেই মনে হলো, নেহাত ছোট চাকরি করলে জয়দেব ওর সম্মান রাখতো না।

যে দু'তিনজন লোক চা খেতে-খেতে গল্প করছিল, তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, মিঃ রণেন ভৌমিক কোথায় ?

লোকটি আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললো, ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, আমি বাইরের লোক !

একজন বাইরের লোক রাত সাড়ে এগারোটায় থানার কম্পাউন্ডে দাঁড়িয়ে চা খায় কেন কে জানে !

ভেতরে ঢুকে দেখলুম, দু'তিনটে বেঞ্চিতে একগাদা লোক বসে আছে, তাদের মধ্যে নারী ও বুড়োও বাদ নেই। টেবিলের উল্টোদিকে পুলিশের পোশাক-পরা একজন লোক একটা লম্বা খাতায় কী যেন লিখে যাচ্ছে একমনে।

এ লোকটাই রণেন না তো ? বেশির ভাগ পুলিশেরই লম্বা-চওড়া একরকম চেহারা।

আমি ডাকলুম, রণেন ?

লোকটি মুখ তুললো, তারপর কয়েক পলক নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। এ লোকটা রণেন নয়, কিন্তু এত কী দেখছে আমাকে ? একেই বলে মর্মভেদী দৃষ্টি।

একটু বাদে হাত তুলে সে বললো, পাশের ঘরে যান।

পাশের ঘরে একজন পুলিশ টেবিলের ওপর লম্বা ঠ্যাং তুলে রয়েছে, আর একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে, আর একটি লোক বসে আছে চেয়ারে, এই লোকটি রাজার সঙ্গীদের একজন !

টেবিলের ওপর ঠ্যাং তোলার ভঙ্গি দেখেই রণেনকে চিনতে পারলুম। কলেজের আমল থেকেই ওটা ওর মুদ্রাদোষ।

রণেনই প্রথম জিজ্ঞেস করলো, কী চাই ?

—রণেন, আমি নীলু !

—হ্যাঁ, কী চাই ?

—রগেন, চিনতে পারছিস না ? আমি নীলু, তোর সঙ্গে কলেজে পড়তুম, জয়দেব, অজয়, প্রীতম, সবাই একসঙ্গে, মনে নেই ?

—হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন ? তুই যে নীলু তাও তো দেখতে পাচ্ছি । কিন্তু এত রাত্তিরে তো হঠাৎ কলেজের বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার ঠিক উপযুক্ত সময় নয় । এখন কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছি !

—আমি একটা বিশেষ দরকারে এসেছি ।

—সেইজন্যই তো বারবার জিজ্ঞেস করছি, কী চাই । কী দরকার সেটা চটপট বলে ফ্যাল !

আমি রাজার বন্ধু ও অন্য পুলিশটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললুম, সেটা একটু প্রাইভেটলি বলতে চাই ।

অন্য পুলিশটি ভুরু কুঁচকে বললো, আপনি....আপনাকে কোথায় দেখেছি...আজই...আজ সন্ধ্যাবেলা আপনি হিরনানি ম্যানসানে একটা বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন না ?

আমি আকাশ থেকে পড়ার ভঙ্গি করে বললুম, হিরনানি ম্যানসান ? সেটা আবার কী ? জীবনে নাম শুনিনি !

আবার রগেনের দিকে তাকাতেই সে অতিকণ্ঠে চেয়ার ছেড়ে উঠলো । বেশ বিরক্ত ভঙ্গি করে বললো, চল, ঐ ঘরটায় চল ।

অন্য পুলিশটিকে বললো, আপনি চালিয়ে যান !

পাশের ঘরটি বেশ সুসজ্জিত । গদি-মোড়া চেয়ার । দেয়ালে রাজীব গান্ধীর ছবি ।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে রগেন কড়া গলায় বললো, আমরা সত্যি খুব সিরিয়াস কাজে ব্যস্ত । পাঁচ বছর বাদে রাত বারোটোর সময় তুই ইয়ার্কি করতে আসিসনি আশা করি । কী ব্যাপার, কোনো চুরি-ডাকাতিতে ফেঁসে গেছিস ? রেপ কেস ? বউ-এর আত্মহত্যা হলে কিন্তু কোনো সাহায্যই করতে পারবো না, আগে থেকে বলে রাখছি ।

আমি অভিমানের সঙ্গে বললুম, রগেন, তুই আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছিস ? তোর জন্য আমি এই অ্যাটখানি কাগজ খেয়ে ফেলেছিলাম...তারপর তিনদিন আমার যা কনস্টিপেশান গেছে ।

এতক্ষণে রগেনের ঠোঁট ফাঁক হলো । প্রথমে আস্তে, তারপর বেশ জোরে হেসে উঠলো । অবিকল জয়দেবের স্টাইলে আমার পিঠে একটা বিরাশি সিক্কা চাপড় মেরে বললো, হ্যাঁ । হ্যাঁ, তুই আমার জন্য কাগজ খেয়ে ফেলেছিলি, কী করে খেলি রে ? ঠিক ম্যাজিশিয়ানদের মতন...যাক, ও ঘটনাটা মনে করে

রেখেছিস কেন ? খবরদার আর কারুকে বলিস না এখন ।

—রণেন, তোর কাছ থেকে একটা ব্যাপারে সাহায্য চাই !

—তার আগে বল তো, তুই আজ হিরনানি ম্যানসানে গিয়েছিলি কেন ?

—কে বললো গিয়েছিলুম ?

—শোন, নীলু, পাশের ঘরে ঐ যে আমার কলিগ তাপস ভৌমিক, ওর চোখের কোনোদিন ভুল হয় না । ও যখন বলেছে, তখনই বুঝেছি, তোকে ঠিকই দেখেছে । তোর মতন ভীতু-ভীতু ছেলে ওখানে গিয়েছিল শুনে আমি আশ্চর্য হচ্ছি ।

—কেন, হিরনানি ম্যানসানে বুঝি শুধু সাহসী আর বীরপুরুষরা থাকে ? যাক গে যাক, আচ্ছা রণেন, পাশের ঘরে যে লোকটাকে তোরা দু'জনে মিলে জেরা করছিলি, তার নাম কী রে ?

—নীলু, কেউ থানায় এসে আমাদের প্রশ্ন করে না । আমরা প্রশ্ন করি । অন্যরা উত্তর দেয় । তুই এখনও উত্তর দিসনি, তুই হিরনানি ম্যানসানে কী করছিলি ?

—তা বলে তুই আমার সঙ্গেও পুলিশী ব্যবহার করবি নাকি ? তা হলে আমি এফুনি পাশের ঘরে গিয়ে তোর ঐ কলিগ তাপস ভৌমিককে বলে দেবো যে তুই পরীক্ষায় টুকলি করতে গিয়ে আর একটু হলে ধরা পড়ে যাচ্ছিলি । আমি তোকে বাঁচিয়েছি ।

—চুপ চুপ, নীলু, তোর একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই । চ্যাঁচাচ্ছিস কেন ? এতদিন পর ঐ সব কথা কেউ তোলে !

—তা হলে বল ঐ লোকটার নাম কী ?

—ওর নাম চঞ্চল বক্সী । তা জেনে তোর লাভ কী !

—ও কী কাজ করে ?

—কী মুশকিল ! তুই শুধু-শুধু সময় নষ্ট করছিস, নীলু ! যদি আমার কাছ থেকে সত্যি-সত্যি কোনো সাহায্য চাস, তা হলে আসল কথাটা বল তাড়াতাড়ি ।

—হিরনানি ম্যানসান থেকে তোর ঐ কলিগ তাপস ভৌমিক আজ কয়েকজনকে ধরে এনেছে । তাদের মধ্যে রাজা সরকার নামে কেউ আছে ? তাকে যে-কোনো উপায়ে হোক ছেড়ে দিতে হবে ।

রণেন থুতনিতে হাত দিয়ে গুম হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার চোখের দিকে । যদিও সে আমার কলেজের বন্ধু, তবু সে পুলিশী মর্মভেদী দৃষ্টি দেবার লোভ সামলাতে পারছে না ।

—চুপ করে রইলি কেন, রণেন ? রাজা সরকার নামে কেউ আছে ?

—আছে।

—তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

—রাজা সরকার তোর কে হয়? আত্মীয়? বন্ধু? বিজনেস পার্টনার?

—এর একটাও না।

—তবে?

—তবু ওকে ছেড়ে দিতে হবে। আমার বিশেষ দরকার।

—নীলু, আমাকে অগাধ জলে রেখে তোর কোনো লাভ হবে না। সব কথা আগে খুলে বলতে হবে। উইথ ফুল ডিটেইলস। তুই কেন হিরনানি ম্যানসানে গিয়েছিলি আগে সেখান থেকে শুরু কর।

এরপর আমাকে খুলে বলতেই হলো, যথাসম্ভব সংক্ষেপে। এবং হাসির নাম বাদ দিয়ে। এই থানার মধ্যে হাসির নাম উচ্চারণ করাও যেন অপরাধ।

কিন্তু পুলিশে কাজ করে রণেনের এর মধ্যেই অনেকটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। সে ঘটনার বর্ণনা শোনামাত্র বললো, এর মধ্যে একটা মেয়ে আছে। ফিমেল ক্যারেকটার ছাড়া কোনো নাটক-গল্প জমে না। এর মধ্যেও একটা মেয়ে আছে, যার সঙ্গে ঐ রাজা সরকারের বিয়ে হবার কথা ক'দিন বাদেই। সেই মেয়েটা তোর কে হয়?

—কেউ নয়!

—অর্থাৎ তার ওপর তোর উইকনেস আছে। এই কথাটা আগে বলবি তো! এখনো কাগজের লোকদের কিছু জানানো হয়নি। এক্ষুনি সব খবরের কাগজে টেলিফোন করে দিচ্ছি, কাল সকালেই সব কাগজে বেরিয়ে যাবে। তারপর ওকে কোর্টে প্রোডিউস করবো, এমন প্যাচ মেরে কেস লিখবো যাতে ও বেইল না পায়। আবার হাজত-বাস। অন্তত এক মাস। বিয়ে ভগূল। তুই গিয়ে এবার চান্স নে!

আমি হুমড়ি খেয়ে রণেনের হাত জড়িয়ে ধরে বললুম, খবরদার, ও কথা চিন্তাও করিস না। রাজা সরকারের কথা ঘুনাঙ্করে কারকে জানানো চলবে না। ওর কোনো দোষ নেই। ওর বন্ধুরা ওকে জোর করে হিরনানি ম্যানসানে ঐ ফ্রি এন্টারপ্রাইজে নিয়ে গিয়েছিল। যে-করেই হোক ওকে আজ ছেড়ে দিতেই হবে, ওর বিয়ের ব্যাপারে যেন কোনো ক্ষতি না হয়!

—তুই একটা বোকা, নীলু! এ বিয়ে ভাঙবেই। তুই না চান্স নিস, অন্য কেউ চান্স নেবে। আড়ালে আর একজন কেউ আছে।

—তার মানে?

—ঐ ফ্রি এন্টারপ্রাইজে কী কারবার চলে, তা আমরা জানি। তবু ইচ্ছে

করেই ওটা একেবারে তুলে দিই না, কারণ মাঝে মাঝে ওখানে রাখব বোয়াল ধরা পড়ে। ফ্যাংকলি বলছি, তাতে আমাদের দু'চার পয়সা আসে। তোরা বুঝবি না। কিছু উপরি রোজগার না থাকলে থানা চালানো যায় না। একটা এত বড় থানা চালানো কি চাট্টিখানি কথা? আজকাল সব জিনিসের যে-রকম দাম বেড়েছে!

—এদের অ্যারেস্ট করে তোরা টাকা আদায় করবি?

—শোন ভালো করে। আমাদের ইনফরমার আছে, তারা খবর আনে। কিন্তু এই কেসটার ব্যাপারে আমরা আগে কোনো খবর পাইনি। কিন্তু একজন কেউ সঙ্গে ছ'টা নাগাদ ফোন করে খবর দিল, অ্যাননিমাস কল। বললো যে, আজ ফ্রি এন্টারপ্রাইজে একটা পার্টি আসবে, তাদের মধ্যে একজন একটা বড় কম্পানির অফিসার। কয়েক দিন পরেই তার বিয়ে। তা হলে বোঝ, যে-ফোন করেছে, সে নিশ্চয়ই ওদেরই দলের লোক। এই বিয়েটা ভাঙায় তার ইন্টারেস্ট আছে।

—তোরা সেই বাজে লোকটাকে সাহায্য করবি?

—রাজা সরকার একটা ক্রাইম করেছে, তা তো ঠিকই। ইম্মরাল ট্রাফিক...পুলিশ যখন ঘরে ঢোকে, তখন বোতল তুলে মারতে এসেছিল।

—রাজা সরকার মারতে এসেছিল?

—ও বোতল তোলে নি, তবে ওর নামেই চার্জটা দিয়ে দেবো!

—না, প্লীজ রণেন, না, তোকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

—রাজা সরকার একটা ভালো কম্পানিতে পারচেজ অফিসারের কাজ করে। এসব হচ্ছে প্রাইজ পোস্ট, বুঝলি? ওরা হচ্ছে করলে লাখ লাখ টাকার অর্ডার দিতে পারে। সেই জন্য ওদের ঘিরে অনেক ইন্টারেস্টেড পার্টি থাকে, দু'পক্ষেরই দেওয়া-নেওয়া চলে। এখন দেখা যাচ্ছে, ঐ সব লোকের মধ্যেই কেউ একজন রাজা সরকারকে খুব অপছন্দ করে, সে ওর বিয়েটা ভেঙে দিতে চায়।

—সেই লোকটাকে জেলে দে। রাজা সরকারকে ছেড়ে দে!

—এটা অনেক বড় ব্যাপার রে, নীলু! আমার একার কিছু হাত নেই। এ থানার বড়বাবু দু'দিন ছুটি নিয়েছেন, তিনি থাকলে আমি তোকে এ ঘরে বসাতেই পারতুম না। কেস-টেক সব লেখা হয়ে গেছে, একটু বাদেই আমরা রাজা সরকারকে হাসপাতালে পাঠাবো!

—অ্যা। হাসপাতালে কেন? রাজা উন্ডেড হয়েছে ন্যাকি? তোরা মেরেছিস?

—না। সেরকম কিছু না। ও একেবারে ডেড ড্রাংক। ওকে কেউ দু'তিনরকম ড্রিংকস মিশিয়ে হচ্ছে করে ওরকম করে দিয়েছে, তা বোঝাই যায়। এখন হাসপাতালে পাঠিয়ে ওর স্ট্রোক পাম্প করিয়ে ডাক্তারি রিপোর্ট নেবো।

তাতে ওর এগেইনস্টে কেসটা আরও ষ্ট্রং হবে ।

—স্ট্রমাক পাম্প ?

—হ্যাঁ, তারপর আর সাতদিন বাছাধন জল খেতেও ভয় পাবে ।

—রণেন, রণেন, তুই একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে চাস ? তুই সেই মেয়েটাকে দেখিস নি, একবার যদি তাকে দেখতি নিজের চোখে—

—আমি এখনও বিয়ে করিনি রে, নীলু ! বুঝতেই পারছি, মেয়েটা খুব সুন্দর । আমি তাকে দেখলে নিশ্চয়ই আমিও তার প্রেমে পড়ে যেতুম । তাতে ব্যাপারটা আরও কমপ্লিকেটেড হয়ে যেত না ?

—রণেন, তোর জন্য আমি কাগজ খেয়েছিলুম, সেই জন্য তুই আজ এই পুলিশের চাকরিটা করতে পারছিস । সেদিন ধরা পড়ে গেলে তুই রাস্টিকেটেড হয়ে যেতিস, ওরকম ব্যাড রেকর্ড থাকলে তোকে কোনোদিন পুলিশের চাকরিতে নিত না ।

—তুই এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছিস কেন, নীলু ? হ্যাঁ, তুই একবার আমার উপকার করেছিস, দ্যাট ইজ এ ফ্যাক্ট । তার বদলে আমি তোর জন্য কিছু করতে রাজি আছি । কিন্তু কোথাকার কে রাজা সরকার, তার জন্য তোর অত মাথাব্যথা কেন ?

—তুই আমার এই অনুরোধটা শোন, আর কোনো দিন তোর কাছে আমি কোনো উপকার চাইতে আসবো না ।

—তুই একটা জিনিস বুঝতে পারছিস না, আমার একার এত ক্ষমতা নেই । থানাটা হচ্ছে একটা সংসারের মতন, এখানে গোপনে কিছু করা যায় না । সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা নিজেরই তরে, এই হচ্ছে আমাদের সিসটেম, বুঝলি । এখন তোর কথা শুনে যদি আমি একার দায়িত্বে রাজা সরকার সম্বন্ধে কিছু করি, তাতে অন্যরা ভাববে, আমি গোপনে তোর কাছ থেকে টাকা খিচে নিয়েছি । তোর কোনো মন্ত্রী-টম্ব্রির সঙ্গে চেনা নেই ? কোনো মন্ত্রীকে দিয়ে ফোন করাতে পারলে আমরা এককথায় ছেড়ে দেবো !

—মনে কর কোনো মন্ত্রী ফোন করেছে ।

—তার মানে ?

—কোনো মন্ত্রী ফোন করলে তার কথা কি তোরা টেপ-রেকর্ড করে রাখিস ? না লিখিত কোনো ডকুমেন্ট থাকে ? টেলিফোনে মুখের কথা, ধর আমিই বাইরে গিয়ে কোনো জায়গা থেকে মন্ত্রী সেজে ফোন করলুম !

—অত সহজ নয় রে ! অত সহজ নয় । মন্ত্রী কি আর আমার মতন কোনো চুনো-পুটিকে ফোন করে ? মন্ত্রী ফোন করবে কোনো আই জি, ডি আই জি,

পুলিশ কমিশনার ব্যাংকের কর্তাদের, তারা আবার ফোন করবে। আমাদের বড়বাবুকে, সেই ফোন পেয়ে আমাদের বড়বাবু ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠে ল্যাজে-গোবরে হয়ে ছুটে আসবে।

—তা হলে ?

—দাঁড়া, আমার কলিগ তাপসবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করে দেখি। তুই এখানেই একটু বোস !

এখন কত রাত হলো কে জানে ? আমার হাতে ঘড়ি নেই, দেয়ালের একটা বড় ঘড়িতে অনেকক্ষণ ধরে বারোটা বেজে আছে। বারোটা বেজে যাওয়া তা হলে একেই বলে।

কোন একটা ঘরে কে যেন তারস্বরে চ্যাচাচ্ছে। কেউ কারুকে মারধোর করছে নাকি ? জেরা করার সময় নাকি হাতে পায়ে সিগারেটের ছাঁকা দেয় ? আজকাল আর ফাঁসি দেবার দরকার হয় না, থানার মধ্যেই কয়েদীরা যখন তখন মরে যায়। ওরা নাকি হার্ট ফেইল করে কিংবা গলায় দড়ি দেয় !

একটু পরেই সহকর্মীটিকে নিয়ে ফিরে এলো রণেন। দরজা বন্ধ করে দিল। এই তাপসবাবুটি ফর্সা টুকটুকে চেহারা, দেখলে পুলিশ বলে মনেই হয় না, কিংবা সিনেমার নায়করা এইরকম পুলিশ সাজে।

লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, তাহলে আজ সন্ধ্যাবেলা হিরনানি ম্যানসানের বারান্দায় আপনি ঠিকই ঘুরছিলেন, অ্যা ? তখন মিথ্যে কথা বললেন কেন ?

আমি মিহি গলায় বললুম, হ্যাঁ, আপনাকে মিথ্যে কথাই বলেছিলুম। ক্ষমা চাইছি। আপনি বুঝি জীবনে কখনো মিথ্যে কথা বলেন না ?

রণেন হা হা করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, জানেন, তাপসবাবু, এই নীলু আমাদের কলেজে ডিবেটে ফাস্ট হতো প্রত্যেকবার !

আমি বললুম, বাজে কথা। আমি জীবনে কখনো ডিবেট করিই নি ! কোনো দিন শুনতেও যেতুম না।

রণেন বললো, ও ডিবেট নয়, আবৃত্তি ! নীলু একবার রবি ঠাকুরের আফ্রিকা কবিতাটা পুরো মুখস্থ বলেছিল। তোর এখনও মনে আছে, নীলু ?

তাপস রণেনের দিকে ধমকের চোখে তাকিয়ে বললো, ওসব কথা থাক। কাজের কথা হোক। আপনি রাজা সরকার সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড ? এই লোকটা একটা টায়ার কম্পানিতে পারচেজে কাজ করে। একটা প্রাইভেট গ্রুপকে সাতাশ লাখ টাকার অর্ডার পাইয়ে দিয়েছে। তার বিনিময়ে ওরা রাজা সরকারের বিয়েতে একটা গাড়ি প্রেজেন্ট করবে কথা দিয়েছিল। সাতাশ লাখ টাকার অর্ডারের

বদলে একটা গাড়ি এমন কিছু না। ঠিকই ছিল। কিন্তু ওদের দলের মধ্যে একজন ডাবল ক্রস করেছে। রাজা সরকারের ওপর তার রাগ আছে। কনট্রাক্টটা সেই হয়ে যাবার পর ওরা একটু সোলিডেট করার নামে রাজা সরকারকে উল্টো-পাল্টা মদ খাইয়ে মাতাল করে দিয়েছিল। ছইস্কির সঙ্গে জিন মেশালে তা হজম করার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। এই রাজা সরকার তো ছেলেমানুষ। তারপর ওকে সেই অবস্থায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওরা হিরনানি ম্যানসনের ফ্রি এস্টারপ্রাইজের খপ্পরে এনে তোলে। রাজা সরকারকে বলেছিল, ঐখানে ওর হাতে নতুন গাড়ির চাবিটা তুলে দেবে। এর মধ্যে ওদেরই একজন টেলিফোনে আমাদের খবর জানিয়ে দেয়।

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, আমাকে থামিয়ে দিয়ে রণেন বললো, তাতে ওদের লাভ হলো এই যে কনট্রাক্টটা তো অলরেডি পাওয়া হয়ে গেছে, গাড়িটা আর ওকে দিতে হলো না।

তাপস তার সঙ্গে যোগ করলো, রাজা সরকারের বিয়েটাও ভেঙে দেবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

—কিন্তু রাজা সরকারের বিয়ে ভেঙে দিয়ে ওদের কী লাভ?

—ঐ যে বললুম, ওদের একজনের রাজা সরকারের ওপর গোপন হিংসে আছে।

—কী জন্য হিংসে তা বলতে পারেন?

—আরে মশাই কে কাকে কী জন্য হিংসে করে, তা কি কেউ বলতে পারে? অনেক সময় কোনো কারণই থাকে না। আমাকে আমার পাড়ার কয়েকটা ছেলে হিংসে করতো। কেন জানেন? শুধু আমার গায়ের রংটা ফর্সা বলে। ভাবতে পারেন?

—কিন্তু আপনারা তো ওদের সবাইকে ধরে এনেছেন, তাই না?

—তাতে কী হয়েছে? ওদের কারুর তো আর আট-দশদিন বাদে বিয়ে নয়! না হয়, কয়েকদিন গারদে থাকবে। তাতে আর এমন কি ক্ষতি হবে! ওদের মধ্যে একজন অবশ্য ছাড়া পাওয়ার জন্য দশ হাজার টাকা অফার করেছে। ক্যাশ টাকা আনতে পাঠিয়েছে।

—কে, রাজা?

—না, রাজা সরকারের এখনও ভালো করে কথা বলার ক্ষমতা নেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শুধু কাঁদছে দেখুন গিয়ে! টাকাটা অফার করেছে চঞ্চল বক্সী। সে-ই পালের গোদা। টাকাটা এসে পড়ুক আগে, তারপর এমন গো বেড়েন দেবো ব্যাটাকে!

আমার মুখের ভাবের নিশ্চয়ই কিছু পরিবর্তন হয়েছিল, তাই দেখে তাপস আবার বললো, অবাক হচ্ছেন বুঝি ? আমার মশাই সাব-সুব কথা । ক্রিমিনালদের কাছ থেকে, বদমাসদের কাছ থেকে আমরা টাকা নিই । যতটা পারি । কথায় আছে না, বর্বরস্য ধনঃ ক্ষয়ম্ ! ওদের হাতে টাকা থাকলেই তো তার মিস-ইউজ হবে ।

রণেন বললো, এদিকে আমাদের থানা চালাবার কত খরচা ! সব কি গভর্নমেন্ট দেয় ?

তাপস বললো, টাকা নিই বটে, কিন্তু ছাড়ি না ঐ ক্রিমিনালদের । টাকা নেবার পরেও পেটাই । কিন্তু কোনো এম এল এ, এম পি কিংবা বিশিষ্ট কোনো ভদ্রলোক ধরা পড়লে আমরা কি তাদের কাছে টাকা চাই ? কক্ষনো না । টাকাও চাই না, পেটাই-ও না, তাদের নাম খবরের কাগজে জানিয়ে দিয়ে তারপর জেনুইন কেস ঠুকে দিই । শুধু মন্ত্রীদের কাছ থেকে যাদের নামে অনুরোধ আসে, তারাই ক্লিন ছাড়া পেয়ে যায় । টাকাও দেয় না, কাগজেও তাদের নাম ওঠে না, আমাদের প্রমোশন নির্ভর করে এই সব কেসগুলোর ওপর । মন্ত্রীদের কাছ থেকে টেলিফোন এলে আমরা খুশিই হই, কী বলেন, রণেনবাবু ?

—এ ব্যাটারদের নামে না টেলিফোন এসে যায় !

—আজ রাত্তিরে আর চাপ নেই । মন্ত্রীরাও তো মানুষ নাকি, তারা এত রাতে ঘুমোবে না ?

আমি অনেকখানি দমে গিয়ে বললুম, তা হলে রাজা সরকারকে নিয়ে আপনারা কী করবেন ঠিক করেছেন ?

তাপস বললো, ওর নামে ডায়েরি লেখা হয়ে গেছে, এখন আর তো কোনো উপায় নেই । রাতটা আটকে রেখে কাল সকালে কোর্টে প্রোডিউস করতে হবে ।

তাপসের তুলনায় রণেনের ব্যক্তিত্ব কিছু কম । সে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানিয়ে বললো, তা-তো বটেই, আর কোনো উপায়ই তো নেই ।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, রাজা সরকার কি সত্যি একজন ক্রিমিন্যাল ?

তাপস আঙুল মটকাতে মটকাতে বললো, দেখুন, আমার স্পষ্ট কথা । ঐ সাতাশ লাখ টাকার কনট্রাকটের বিনিময়ে ও যে একটা গাড়ি নিতে চেয়েছিল, তাতে পুলিশের মাথা গলাবার কিছু নেই । সেটা ওদের প্রাইভেট ব্যাপার । কিন্তু ফ্রি এন্টারপ্রাইজে গিয়ে বেলেলা করা, সেটা একটা অপরাধ ।

—কিন্তু আপনিই তো বললেন, সেখানে ও নিজের ইচ্ছেতে আসেনি । ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে এসেছে ।

—তা তো বলেইছি ।

—তা হলে একটা লোক নিরপরাধ জেনেও আপনারা তার সর্বনাশ করবেন ? এই খবর রটে গেলে ওর বিয়ে ভেঙে যাবে ।

—কিন্তু আমরা তো এখন কেস ডায়েরির খাতা ছিঁড়ে ফেলতে পারি না । সে রিস্ক কে নেবে ? রণেনবাবু, আপনি রাজি আছেন ?

রণেন আঁতকে উঠে বললো, মাথা খারাপ ! আমায় চাকরি বাঁচাতে হবে না ! কলেজের বন্ধু বলে কি তার কথায় আমি যা খুশি করতে পারি ?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললুম, রণেন, তা হলে তোর সহকর্মীকে আমি সেই কথাটা ফাঁস করে দিই ?

রণেন দু'হাত তুলে বললো, চুপ, চুপ, নীল, চুপ কর !

তাপস সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার ? আপনার কিছু সিক্রেট আছে বুঝি ?

রণেন বললো, সে কথা আপনাকে পরে বলবো । এমন কিছু না । শুধু যেন বড়বাবুর কানে না যায় । ও'ভাই তাপসবাবু, এই ছেলেটার জন্য যে একটা কিছু করতেই হয় । একটা উপায় বার করুন !

তাপস বললো, উপায় আমি আগেই ভেবে রেখেছি । একটাই রাস্তা খোলা আছে ।

তারপর সে রণেনের দিকে ঝুঁকে ফিস ফিস করে বললো, আপনার বন্ধুকে ইম্পারসোনেট করতে হবে । উনি রাজি আছেন কি না জিজ্ঞেস করুন !

রণেনের চোখ জ্বলে উঠলো । সে মহা উৎসাহের সঙ্গে বললো, ঠিক ঠিক ? এইটাই একমাত্র উপায় । নীল, তোকে ইম্পারসোনেট করতে হবে ।

আমি বললুম, তোদের ঐ পুলিশি ইংরিজি আমি বুঝি না । ইম্পারসোনেট করতে হবে মানে কী ? কাকে ইম্পারসোনেট করবো ?

—বুঝিয়ে দিচ্ছি । বুঝিয়ে দিচ্ছি । রাজা সরকারের নামে ডায়েরি লেখা হয়ে গেছে, সেটা তো ছিঁড়ে ফেলা যায় না । মানে, খুব এক্সট্রা অর্ডিনারি কেস না হলে আমরা ছিঁড়ি না । এটা তো পেটি কেস । রাজা সরকারকে কাল কোর্টে প্রোডিউস করতেই হবে । তোর কথা মতন আমরা রাজা সরকারকে এখন ছেড়ে দিতে রাজি আছি । তার বদলে তোকে রাজা সরকার সাজতে হবে । রাতিওটা তুই হাজতে থেকে কাল সকালে কোর্টে যাবি ! জজ সাহেব যদি ভালো মেজাজে থাকেন...

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, কী ? আমি অন্য লোকের নামে হাজতে থাকবো ? কোর্টে যাবো ? জেল খাটবো ? ওরে বাবা, না, না !

আমি ছুটে পালাতে যাচ্ছিলুম, তাপস আর রণেন দু'দিক থেকে এসে আমায়

চেপে ধরলো। আমি চিৎকার করে বললুম, আমাকে ছেড়ে দাও ! আমাকে ছেড়ে দাও ! আমি জেলে যেতে রাজি নই।

রণেন আমার পিঠ চাপড়ে বললো, আরে, এত ভয় পাচ্ছিস কেন ? এমন, কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। আমরা কেসটা নরম করে লিখে দেবো। জজ সাহেব তোকে বেকসুর খালাস দিতে পারেন। না হয় বড়জোর মাস খানেক জেল খেটে আসবি। দেখিস খুব একটা খারাপ লাগবে না, জেলের মধ্যে সব কিছু পাওয়া যায়।

তাপস বললো, এত কষ্ট করে এসেছেন, আমাদের এতটা সময় নষ্ট করালেন, এখন আপনি ব্যাক আউট করলে চলবে কেন ? আমাদের টাইমের দাম নেই ? এখন আর আপনাকে ছাড়ছি না !

দু'জনে আমাকে ঠেলে ঠেলে এনে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল। তাপস নিজের প্যাকেট খুলে বললো, নিন, একটা সিগারেট খান। চা খাবেন ? আমাদের এখানে সারা রাত চা পাওয়া যায় !

যেন আমার জীবনে এই শেষ চা খাওয়া। মাথা নেড়ে বললুম, খাবো !

তাপস হাঁক দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চা এসে গেল। তার একটু পরেই একজন কনস্টেবল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খটাস করে এক স্যালুট দিয়ে তাপসকে বললো, স্যার, চিড়িয়া ওয়াপস আয়া।

তাপস বললো, দশ হাজার হ্যাঁ ? গিন্টি কর লে-ও।

—গিন্টি কর লিয়া, স্যার। সব ঠিক হ্যাঁ।

—যে লোকটা নিয়ে এসেছে, তাকেও ধরে রাখো।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, চলুন, এবারে যাওয়া যাক।

রণেন বললো, একটু দাঁড়ান, ও বেচারা চা-টা শেষ করে নিক। শোন নীলু, তোর বন্ধু ঐ রাজা সরকারকে আমরা ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি। থানার গাড়িতে গেলে ওর বাড়ির লোক ভয় পেয়ে যেতে পারে !

তাপস বললো, থানার গাড়ি পাচ্ছেনই বা কোথায়। তিনটির মধ্যে দুটো খারাপ হয়ে পড়ে আছে, একটা রাউন্ডে গেছে।

—তোকে ট্যাক্সি ভাড়াটা দিতে হবে না। সে আমরা ম্যানেজ করে নেবো। আমাদের কত দিকে কত খরচ হয় দ্যাখ। এসব তো তোরা বাইরে থেকে বুঝিস না !

থানার ভেতরের এই অংশটা শুধু সিনেমাতেই দেখেছি দু'একবার। লোহার একটা গেট খোলার পর ভেতরে ছোট ছোট খুপরি। তার মধ্যে কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে, কেউ ওরই মধ্যে থুতু ফেলছে। বমির বিকট গন্ধ এলো

নাকে । দু'একজন লোকের চেহারা দেখে মনে হয়, দু'দশটা খুন করা ওদের পক্ষে কিছুই না ।

একটা ঘরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে রাজা । এখনও একটু একটু ফোঁপাচ্ছে । নেশা অনেকটা কেটে গেছে মনে হয় ।

তাপস বললো, রাজা সরকার ! উঠে আসুন, রাজা সরকার !

আমি উল্টো দিকে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালুম । রাজা যেন আমাকে দেখতে না পায় । আমারও তো একটা প্রেস্টিজ আছে !

রাজা উঠে এসে ওদের সামনে দাঁড়ালো । তাপস বললো, এই সব বাজে লোকের সঙ্গে মেশেন কেন ? মদ খেতে হয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে । অন্য কেউ স্কচ খাওয়াতে চাইলেও ছুট করে রাজি হয়ে যেতে নেই ।

রণেন বললো, এবারে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি । ফের যদি কোনো দিন হিরনানি ম্যানসানের ধারেকাছে দেখি, এক বছর জেলের ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়বো, আর কাগজে নাম ছাপিয়ে দেবো !

রাজা একটি কথাও বললো না । কথা বলার ক্ষমতা নেই বেচারার । রণেন তার হাত ধরে নিয়ে গেল ।

তাপস আমার দিকে ফিরে বললো, নিন, এবারে আপনি ঢুকে পড়ুন ।

সেলটার মধ্যে দু'জন লোক শুয়ে আছে, আর একজন লোক বসে আছে তীব্র চোখ মেলে । সব ঘটনাটা সে দেখলো ড্যাবডেবিয়ে । এবারে সে বলে উঠলো, তাপসবাবু, আপনি ওকে...

তাকে শেষ করতে না দিয়ে তাপস হুংকার দিয়ে বলে উঠলো, চোপ ! তারপর তাকে ক্যাৎ করে একটা লাথি কষালো ।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমার দিকে ফিরে হেসে বললো, আপনাকে এখানেই থাকতে হবে, অন্য কোনো সেলে জায়গা নেই । এই লোকটাই পালের গোদা, এর নাম চঞ্চল বক্সী । এ যদি আপনাকে আঁচড়ে কামড়ে দিতে আসে, আপনি দরওয়াজা, দরওয়াজা, বলে চ্যাঁচাবেন । আমরা এসে ওর হাত-পায়ের কবজিগুলো ভেঙে দেবো । এমনিতেই আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে আর একবার রাউন্ডে আসছি । ওর সঙ্গে কথা আছে ।

আমি ধপ করে বসে পড়লুম সেখানে । একেবারে সেই লোকটার মুখোমুখি । আমি এখন রাজা সরকার !

কেন যে লোকে অন্য সময় গঙ্গাসাগরে বেড়াতে আসে না ! মেলার সময় এখানে প্রচুর ভিড়-ভাড়া, সাধু, চোর-ছ্যাচোড় আর ভিখিরির সংখ্যাই থাকে প্রচুর, তার ওপর আবার কলেরার ইঞ্জেকশান ইত্যাদির ঝঞ্ঝাট । কিন্তু অন্য সময় জায়গাটা কী সুন্দর, নিরিবিলি, পরিচ্ছন্ন । ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে । মেলার সময় যেখানে প্রচুর তাঁবু থাকে, এখন সেখানে তরমুজ ফলে আছে । বেলাভূমিতে ছোট ছোট লাল লাল কাঁকড়া দৌড়ে বেড়াচ্ছে, মনের সুখে, কেউ তাদের বিঘ্ন ঘটাতে আসবে না ।

নামখানা থেকে সাইকেল ভ্যান কিংবা নৌকোয় এখানে বেশ স্বচ্ছন্দে আসা যায় । একটা ছোট ডাকবাংলোও আছে । একলা একলা বসে স্যান্ডহেডের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো, এক হিসেবে ভারতের এক প্রান্তে চলে এসেছি । এরপর আন্দামান চলে যেতে পারলে হতো । এককালের কয়েদীদের আন্দামানে পাঠানো হতো । এক হিসেবে আমিও তো তাদেরই দলে । অন্তত এক রাত তো হাজতে কাটিয়েছি । পরদিন হাকিম আমাকে ইচ্ছে করলেই জেলে ভরে দিতে পারতেন । একদল পলিটিক্যাল প্রিজনার এসে পড়ায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন ।

হাকিমের রায়ের মধ্যে কোনো নাটকীয়তা ছিল না । তিনি ফিসফিস করে তাঁর পাশের পেশকারকে কী যেন বললেন । কোর্ট ইম্পেক্টর আমাকে জানালো । যান, প্রথম অপরাধ হিসেবে ছাড়া পেয়ে গেলেন । ফার্স্ট ওয়ার্নিং । আসামী রাজা সরকার খালাস !

কিন্তু ঐ এক রাত হাজতবাসই আমার পক্ষে এক যুগ নরকবাসের সমান । ঐ টুকু ছোট ঘরের মধ্যে হুঁজন লোক, ভেতরে উৎকট পেছাপের গন্ধ । একটা দাড়িওয়ালা লোক গাঁজার নেশায় কিমিয়ে কিমিয়ে খুব খারাপ ভাষায় গালাগাল দিচ্ছিল আপন মনে । আমার মুখোমুখি বসে থাকা ঐ চঞ্চল নামের লোকটা আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি বটে, কিন্তু আমি একটু অন্যমনস্ক হলেই সে টুক করে একটা লাথি মারছিল আমাকে । আমার ওপর তার রাগ কেন কে জানে ? আমি যে আসল রাজা সরকার নই তা তো সে জানেই । তবে ? আমিও লাথি ফিরিয়ে দিচ্ছিলুম । সারা রাত ধরে চললো সেই লাথি মারামারির প্রতিযোগিতা !

এখানে এসে যেন নতুন জীবন ফিরে পেলাম । এই টাটকা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিলে বুকটা যেন পবিত্র হয়ে যায় । দিকশূন্যপুরেই থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ভাঙা

মন নিয়ে সেখানে যাওয়া ঠিক নয়। একটু সারিয়ে নিই, তারপরই আবার দিকশূন্যপুরে পালাবো।

বিদায় রাজকুমারী, বিদায় রাজা সরকার, চন্দনদা-উজ্জয়িনী, বিদায় রেকর্ড প্লেয়ার, বাউল গান, শান্তিনিকেতন, জয়দেবের বাড়ি ও গাড়ি...আমি এখানে বেশ সুখে আছি।

বাংলোর রাঁধুনীটি চমৎকার ঝিঙে-পোস্ত রাঁধে। গরম বাড়া ভাত, মুসুরির ডাল আর ঝিঙে পোস্ত, এর চেয়ে আর কী চাই। নৌকোর মাঝিদের কাছ থেকে পার্শে মাছ পেলে তো সোনায়ে সোহাগা।

খানিকটা দূরে একটা ইরিগেশানের লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। কোনো স্টিমার বা লঞ্চ একেবারে তীরে ভিড়তে পারে না, নৌকো করে যাতায়াত করতে হয়।

ঐ লঞ্চের কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। প্রায়ই বাংলাতে আসে টিউবওয়েলের জল নিতে। ভারী হাসি-খুশি সজ্জন মানুষগুলি। নদীর বুকে যারা ঘোরে তারা বুঝি এরকমই হয়।

একটা নৌকো আমার কাছাকাছি এলো। একজন হেঁকে বললো, আসবেন নাকি লঞ্চে? আসুন, একটু চা খেয়ে যাবেন।

এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার কোনো মানে হয় না। বিকেলের আকাশ লাল হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। এখন লঞ্চের ডেকে বসে চা খেতে চমৎকার লাগবে।

নৌকোয় দু'জন ভদ্রলোক, রবীনবাবু আর অমলবাবু। এর মধ্যে অমলবাবু বেশ বড় অফিসার, তিনি সরকারী পরিদর্শনে এসেছেন, কোনোরকম অহংকার নেই, অতি সদালাপী। এই লঞ্চখানা তাঁরই অধীনে।

ডেকে বসে সবে মাত্র চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছি, আর একখানা নৌকো এসে ভিড়লো লঞ্চের পাশে। একজন বৃদ্ধ ব্যাকুলভাবে ডেকে উঠলো, বাবু! বাবু! আমার ছেলেটাকে বাঁচান!

আমরা সবাই রেলিং ধরে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলুম, কী ব্যাপার? কী হয়েছে তোমার ছেলের?

বৃদ্ধটি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বললো, তার জোয়ান ছেলেকে সাপে কামড়েছে। তার ঐ একমাত্র ছেলে, সে মরে গেলে তার সংসার ভেসে যাবে!

রবীনবাবু এখানকার বি ডি ও। তিনি দায়িত্বপূর্ণ গলায় বললেন, সাপে কামড়েছে তো ওকে নৌকোয় নিয়ে ঘুরছে কেন? হেলথ সেন্টারে যাও!

বৃদ্ধটি জানালো, এখানকার পাঁচখানা হেলথ সেন্টারে সাপের বিষের কোনো ওষুধ নেই। সে খবর নিয়েছে। একমাত্র ডায়মন্ড হারবারে নিয়ে গিয়ে বাঁচাবার

শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে ।

রবীনবাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অমলবাবু তাকে বাধা দিলেন । অমলবাবু দয়ালু লোক । তিনি ছেলেটিকে ওপরে তোলার নির্দেশ দিয়ে বললেন, এখনি লঞ্চ স্টার্ট করতে বলুন । ডায়মণ্ড হারবার যেতে আর কতক্ষণ লাগবে ?

ডান পায়ে অনেকগুলি দড়ির বাঁধন দেওয়া প্রায় অচৈতন্য চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবকটিকে লঞ্চে তোলা হলো । কিন্তু তার বাবা আমাদের সঙ্গে এলো না । তার নৌকোটার কী হবে ? নৌকোর চিন্তাও ছেলের চিন্তার চেয়ে কম নয় ।

বৃদ্ধটির নাম আকবর আলি । সে বললো, কাল ভোরেই সে ডায়মণ্ড হারবার হাসপাতালে চলে যাবে । ছেলেটি যাতে বাঁচে, আমরা যেন সেই দোয়া করি ।

অমলবাবু আমাকে বললেন, চলুন, ডায়মণ্ড হারবার ঘুরে আসি ।

ছেলেটির গালে ছোট ছোট চড় মেরে তাকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করা হতে লাগলো । আমরা উদ্গ্রীব হয়ে ঘিরে বসে রইলুম তাকে । রীতিমতন জোয়ান ছেলে, সামান্য একটা সাপের কামড়ে এর অথবা মৃত্যুর কোনো মানে হয় না । অমলবাবু হটফট করে অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে বারবার বলতে লাগলেন, কী হবে ? কী হবে ? ছেলেটা বাঁচবে তো ! অ্যা ? আরও জোরে লঞ্চ চালাও না ! এত আস্তে যাচ্ছে কেন ?

আমরা বললুম, অমলবাবু, আপনি শান্ত হোন ।

অমলবাবুর বয়েস বাহান্ন-তিনিশ বছর কাছাকাছি । সেই তুলনায় স্বাস্থ্য বেশ ভেঙে গেছে । ঔর এত উদ্বেগ দেখে আমরা ভাবলুম, অমলবাবুরই না শরীর খারাপ হয়ে যায় ।

ডায়মণ্ড হারবার পৌঁছে ছেলেটিকে দ্রুত নিয়ে আসা হলো সরকারী হাসপাতালে । সুখের বিষয় সেখানে সাপের বিষের সিরাম আছে । স্থানীয় ডাক্তারটি আফশোসের সুরে বললেন, কাকদ্বীপ, নামখানার দিকেই ম্যাকসিমাম স্নেক বাইট হয়, অথচ ওখানকার হেল্‌থ সেন্টারেই এই ওষুধ ফুরিয়ে যায় । কী কাণ্ড বলুন তো ! একে এত দেরি করে এনেছেন, দেখি কী করা যায় । অবশ্য বাঁধনগুলো ভালো দিয়েছে ।

আমি ও অমলবাবু বসে রইলুম সেই হাসপাতালে । উনি একটা কিছু পাকা খবর না পেয়ে সেখান থেকে নড়তে চান না । একদম অচেনা-অজানা একটি নৌকোর মাঝির ছেলের জন্য ঔর কী দুশ্চিন্তা ! এরকম মানুষও এখনো আছে পৃথিবীতে ।

দু'জনের মুখে প্রায় কোনো কথা নেই । অমলবাবু ঘন ঘন সিগারেট টেনে যেতে লাগলেন । সামান্য আলাপেই অমলবাবুকে আমার নিকট-আত্মীয়ের মতন

মনে হলো ।

এক ঘণ্টা বাদে ডাক্তারটি এসে বললো, আপনারা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন ? মোটামুটি আপনাদের বলতে পারি, ছেলেটা বেঁচে যাবে । না, সেরকম আর ভয়ের কিছুই নেই, বেঁচেই যাবে ।

অমলবাবু ডাক্তারটির হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, দেখুন, ছেলেটির বাবা সঙ্গে আসেনি, আমিই ওর দায়িত্ব নিয়ে এসেছি । আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো ।

ডাক্তারটি বললো, আমি আর কী করেছি ! আপনার দেখা পেয়ে গেল ওর বাবা, আপনি তাড়াতাড়ি নিয়ে এলেন, তাই তো বাঁচলো । অনেক অফিসার এসব কেস শুনে পাত্তাই দিতে চাইতো না ।

আমি আর অমলবাবু হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলুম । অমলবাবু গভীর তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, আমার যা চিন্তা হচ্ছিল ! আমার নিজের ঠিক ঐ বয়েসী ছেলে আছে । একটাই ছেলে আমার । বার বার মনে পড়ছিল তার কথা । আমার কাছে আমার ছেলে যেমন প্রিয়, ঐ আকবর আলির কাছে তার ছেলেও তো তাই ?

আমি নিঃশব্দে মাথা নাড়লুম ।

অমলবাবু আবার বললেন, দেখুন, এই পৃথিবীতে প্রতিদিন কত লোক বিনা কারণে মারা যাচ্ছে ! কত খুনোখুনি । তার মধ্যে একজন লোকও যদি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে, তা হলে আনন্দ হয় না ?

—নিশ্চয়ই !

—চলুন, নীলুবাবু, আমরা এখানে কোনো হোটেলে খেয়ে নিই । লঞ্চ ফিরতে ফিরতে...

অমলবাবু কথা শেষ করতে পারলেন না, সিঁড়ির শেষ ধাপে ঝুপ করে পড়ে গেলেন ।

আমি চমকে গিয়ে নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী হলো অমলবাবু, পায়ে লাগলো ?

অমলবাবু ফিস ফিস করে বললেন, ব্যথা, বুকে খুব ব্যথা করছে। হ্যাঁ—

আমি দু'তিন সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে সেই ডাক্তারটিকে সামনেই পেয়ে যেতে তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলুম নিচে ।

ডাক্তারটি সামান্য পরীক্ষা করেই বিবর্ণ মুখে বললেন, সার্জিক্যালিক ব্যাপার, এ তো মনে হচ্ছে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক । দাঁড়ান, স্ট্রেচার আনতে বলি...

আমার বুকটার মধ্যে ধড়ফড় করতে লাগলো, এইমাত্র দেখলুম মানুষটাকে

সুখী, তৃপ্ত, তার পরের মুহূর্তেই মৃত্যু এসে থাকা দিল ? মৃত্যুর কি সামান্য বুদ্ধি-বিবেচনা নেই ? এইরকম একটা সত্যিকারের ভালো মানুষকে আঘাত দেবার এই কি সময় ?

অমলবাবুকে আনা হলো ওপরে । উনি আমার হাত চেপে ধরে রইলেন । গুঁর সাম্প্রতিক যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু চৈতন্য একেবারে লোপ পায়নি । ফিস ফিস করে বার বার বলতে লাগলেন, আমাকে কলকাতায় নিয়ে চলুন, কলকাতায়, আমার ছেলের কাছে, আমার স্ত্রী যেন একটা খবর পায়, অন্তত একবার যেন দেখা হয়...

ডাক্তারটিকে আমি সেই কথা জানাতে তিনি বললেন, দেখুন, আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন, যে-রকম ম্যাসিভ অ্যাটাক, এর ভালো মতন চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানে নেই । কলকাতার পি জি বা অন্য কোনো ভালো হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখলে ঠিক মতন চিকিৎসা হতে পারে । আবার অতটা রাস্তা নিয়ে যাওয়া, সেটাও রিস্কি ! কে দায়িত্ব নেবে ? আপনি কি গুঁর আত্মীয় ?

—না, আমি গুঁর কেউ না !

—তবে ?

—যে করেই হোক, অমলবাবুকে বাঁচাতেই হবে ।

—সে তো নিশ্চয়ই । কিন্তু আমার সাধ্য তো খুব বেশি নয় । দাঁড়ান, এস ডি ও-কে খবর দিচ্ছি !

আমি খানিকটা উত্তেজিতভাবে বলে ফেললুম, শুধু খবর দেওয়া নয়, তাঁকে এক্ষুনি এখানে আসতে বলুন !

অমলবাবু আমার কথা শুনতে পেয়েছেন, ফ্যাসফেসে গলায় আবার বললেন, নীলুবাবু, আমায় কলকাতায় নিয়ে চলুন । আমার ছেলেকে, আমার স্ত্রীকে...অন্তত একবার...আমার হার্ট আগেই খারাপ ছিল, আমি জানি, বাঁচবো না আর...অন্তত একবার বাড়ির লোকদের...

এস ডি ও তাস খেলছিলেন । খেলা ছেড়ে উঠে এসে তিনি খুব বিভ্রান্ত বোধ করলেন । তারপর বললেন, অমলবাবু একজন সিনিয়র অফিসার, উনি নিজেই যখন বলছেন কলকাতায় যেতে চান...আমাদের এখানে রাখা...ভালো মতন চিকিৎসা না হলে...আমি গাড়ি দিতে পারি, কিন্তু আমার পক্ষে তো কলকাতায় যাওয়া সম্ভব নয়, কাল একজন মিনিস্টার আসছেন...সঙ্গে কে যাবে ?

ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের একজন জুনিয়র অফিসার, ডাক্তারবাবুটি এবং আমি অমলবাবুকে নিয়ে উঠলুম এস ডি ও-র দেওয়া স্টেশান ওয়াকানে ।

গঙ্গাসাগরের ডাকবাংলোয় আমার সুটকেস ও অন্য জিনিসপত্র পড়ে রইলো, কিন্তু তা নিয়ে এখন চিন্তা করা যায় না। অমলবাবু আগাগোড়া আমার হাত ধরে আছেন।

গাড়ি জোরে চালাবার উপায় নেই। একটুও যাতে ঝাঁকুনি না লাগে সেইভাবে চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ড্রাইভারকে। ডাক্তারবাবু অমলবাবুর পাশে বসে আছেন। কয়েকটা জরুরী ওষুধ দেওয়া হয়েছে এর মধ্যেই। তার মধ্যে একটা ঘুমের ওষুধ। চোখ বুজে যাচ্ছে, তবু তার মধ্যেও তিনি ফিসফিস করে বলে যাচ্ছেন, আগে আমার বাড়ি ঘুরে যাবেন, আমার ছেলেকে, স্ত্রীকে, অন্তত একবার...

কলকাতায় আমরা পৌঁছোলুম রাত একটায়। অমলবাবুর বাড়ি বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে। বাড়ির নম্বর এইট্রি সি। সেই ঠিকানা খুঁজে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই চিনতে পারুলুম। উজ্জয়িনীর বড়দির সেই বাড়ি। অমলবাবুরা দোতলায় ভাড়া থাকেন।

নিয়তি ; গঙ্গাসাগরের কাছে একটা সাপ নিয়তির ছদ্মবেশে আকবর আলির ছেলেকে কামড়ে তারপর ঘটনা পরম্পরায় আমাকে এখানে পাঠিয়েছে !

অমলবাবুর ছেলের নাম সুশান্ত। বাড়ির সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। গাড়ি থেকে নেমে আমি ডাকতে লাগলুম। সুশান্ত ! সুশান্ত ! শিগগির দরজা খোলো। সুশান্ত !

শুধু দোতলা নয়, তিনতলারও জানলা খুলে গেল। সুশান্ত আগে নেমে এলো। তারপর তার মা। তিনি কেঁদে উঠতেই তিনতলা থেকেও নেমে এলো কয়েকজন। তাদের মধ্যে রয়েছে চন্দনদা ও হাসি।

আকাশে ফ্যাকাসে জ্যোৎস্না, তার মধ্যে আলুখালু শাড়ি জড়ানো হাসিকে যেন আমি একযুগ পরে দেখলুম। হাসি জিজ্ঞেস করলো, আপনি ? আপনি এখন কোথা থেকে এলেন ?

আমি বললুম, গঙ্গাসাগর থেকে। কাল সকালেই ফিরে যাবো।

তা অবশ্য হলো না। অমলবাবুকে পি জি হাসপাতালে ভর্তি করতে করতেই রাত তিনটে বেজে গেল। তারপর বাড়ি ফিরে ঘুমোলুম বেলা দশটা পর্যন্ত। আবার ছুটলাম পি জি হাসপাতালে। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে কারুকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না বটে, তবে জানা গেল অমলবাবু অনেকটাই ভালো আছেন। তাঁর ছেলে সুশান্ত জানালো যে ডায়মন্ড হারবার থেকে ওঁকে নিয়ে আসা খুব সুবিবেচনার কাজ হয়েছে। ওখানে থাকলে উনি টেনশানেই মারা যেতে পারতেন। তাছাড়া ওখানে কী চিকিৎসাই বা হতো !

আমি অবশ্য ভাবলুম, অমলবাবুর অবস্থা যদি আজ সকালে খারাপ হতো, তা হলে এই ডাক্তাররাই বলতেন, অতখানি রাস্তা নিয়ে আসা খুব মুখামির কাজ হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারে রেখে চিকিৎসা করাই উচিত ছিল।

উজ্জয়িনীর বড়দির ছেলে বিক্রমের সঙ্গে সুশান্তর খুব ভাব। ও বাড়িতে বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের প্রায় অস্থায়ীতার সম্পর্ক। সেই সুবাদে বিক্রম আর চন্দনদা এসেছেন একবার অমলবাবুর খবর নিতে। যদিও ওঁদের আজ খুবই ব্যস্ততা, আজই সন্ধ্যাবেলা হাসির বিয়ে।

চন্দনদা বললো, নীলু, তুমি কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলে? একদম বেপান্তা? আজ সন্ধ্যাবেলা কিন্তু আসতেই হবে, নইলে হাসি খুব দুঃখ পাবে!

রাত একটার সময় হাসি যদি রাস্তায় নেমে না আসতো এবং স্নান চাঁদের আলোয় আমাকে জিজ্ঞেস না করতো, আপনি কোথা থেকে এলেন? তা হলে আমি আজ বিকেলেই পালিয়ে যেতাম। কিন্তু বিয়ের আগের রাতেও যে মেয়ে রাত একটায় কৌতূহলী হয়ে রাস্তায় নেমে আসে, তার চুষক-টান কিছুতে এড়ানো যায় না।

কেয়াতলায় একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে বিয়ের জন্য। আমি আমার এক মাসতুতো দাদার কাছ থেকে একটা ধুতি ধার করেছি, অনেক দিন পর ধুতি পাঞ্জাবি পরে আমি বোকা বোকা মুখ করে বসে রইলুম এক জায়গায়। চন্দনদা-উজ্জয়িনী এবং ওদের বড়দির ছেলে-মেয়েরা ছাড়া বরপক্ষ-কন্যাপক্ষের আর কারকেই আমি চিনি না। এমনকি হাসির বাবা-মাকেও আগে দেখিনি। বরের বেশে রাজা সরকার পৌঁছেছে একটু আগে। তার সঙ্গে প্রায় শতাধিক বরযাত্রী-যাত্রিনী। অনেকেই দু'পক্ষেরই চেনা। আধা-শান্তিনিকেতনী আর বাকিটা যৌথ পারিবারিক ব্যাপার। এর মধ্যে আমি কে? সম্পূর্ণ একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার।

আমি যেখানে বসে আছি, তার প্রায় সামনেই একটা সিঁড়ি। দারুণ সাজগোজ করা সুন্দরী মেয়েরা সিন্ধের শাড়ি সপসপিয়ে ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠছে আর নামছে। আজ যদি হাসির বিয়ে না হতো, তা হলে ঐ সব মেয়েদের লাস্য দেখেই আমি চমৎকার সময় কাটিয়ে দিতে পারতুম।

কিন্তু মনের মধ্যে পাতলা পাতলা সাদা মেঘের মতন বিষাদ কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারছি না। এর নাম দুঃখ-বিলাসিতা। হাসিকে কি আমি নিজের করে চেয়েছি কখনো, না। কক্ষনো চাইনি। তবু একটা বিচ্ছেদবেদনা। এর কী মানে আছে? গঙ্গাসাগরের সেই নির্জন ডাকবাংলোয় কী চমৎকার ছিলাম, সেখানে হাসির মুখ আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছিল, আমি তৈরি হচ্ছিলাম দিকশূন্যপুরে

যাবার জন্য ।

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দু'তিনটি মেয়ের সঙ্গে ফস্টিনসি করছে এক সদ্য যুবক । তার হাতে একটা রসগোল্লার ভাঁড় । সে একটা করে রসগোল্লা ঐ মেয়েদের খাওয়াবেই । তাই নিয়ে জোরাজুরি, হাসাহাসি, বিশুদ্ধ কৌতুক ।

আজকাল সবাই ক্যাটেরার দিয়ে খাওয়ায়, বাড়ির ছেলেরা পরিবেশন করার সুযোগ পায় না । ঐ ছেলেটার হাতে মিষ্টির হাঁড়ি কী করে এলো ? বোধ হয় বরযাত্রীদের জন্য স্পেশাল । এখন মেয়েরাও এত ডায়েটিং সচেতন যে কিছুতেই মিষ্টি খেতে চায় না । তবু ছেলেটি জোর করে খাওয়াতে গেল, খানিকটা রসগোল্লার রস উথলে পড়লো সিঁড়িতে ।

আমি এখন খেয়ে-দেয়ে পালাতে পারলেই বাঁচি । এরকম অচেনা লোকজনের মধ্যে বসে থাকতে ভালো লাগে ? কতক্ষণ বসে থাকবো ? এ যেন অরেক হাজতবাস ! কিন্তু চন্দনদা দু'তিনবার এসে বলে গেছে, নীলু, আগে খেয়ে নিসনি । আমরা একসঙ্গে বসবো । খবরদার, পালাসনি যেন !

চন্দনদা আমার বাড়ি চিনে গেছে, এখন আর পালাবার কোনো উপায় নেই । রেডিও স্টেশনে একটা কোনো চেনা লোক খুঁজে বার করতেই হবে !

হঠাৎ আমার পাশে এসে দাঁড়ালো উপেনদা । সাড়স্বর উল্লাসের সঙ্গে বললেন, নীলু, তুই এখানে ?

আমি বললুম, উপেনদা, তুমি ? এসো, এসো, এতক্ষণে একটা বেশ লোক পেলুম । তুমি কি এখানেও ম্যারাপ বেঁধেছো নাকি ? সেদিন বলোনি তো ? বলেছিলে বউ-ভাতের কথা ?

উপেনদা আমার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন, আরে নাঃ, সব জায়গাতেই আমি ম্যারাপওয়ালা নাকি ? তোকে বলেছিলুম না, ডেকরেটরদের কেউ নেমস্তন্ন করে না ? আসলে ব্যাপার কী জানিস, আজকের যে কনে, অনামিকা না অনিন্দিতা কী যেন নাম—

—অনিন্দিতা !

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনিন্দিতা, সে যে আমার ছোট মেয়ের সঙ্গে দিন কতক পড়তো । ঐ তাদের ফিলোজফি না কী বলে ?

—ফিলসফিটা আমাদের কেন হবে, উপেনদা ? আমিও কোনোদিন ও জিনিস পড়িনি । তুমিও পড়েনি ।

—ঐ হলো রে ! সেই কানেকশানে মেয়েটা আমাদের নেমস্তন্ন করেছে । হোল ফ্যামিলিকেই করেছিল । কিন্তু জানিস তো, আমার পরিবার কোথাও যায় না । তাই মেয়েকে নিয়ে আমাকেই আসতে হলো ।

—খুব ভালো করেছে, উপেনদা, এতক্ষণ আমার বড্ড একা একা লাগছিল ।
এরপর একসঙ্গে খেতে বসবো ।

উপেনদা চেয়ারটা একটু টেনে এনে ফিসফিস করে বললো, খাবারের মেনু কী আছে এসেই খোঁজ নিয়েছি, বুঝলি ? চিংড়ির কাটলেট আছে । এই ক্যাটেরাররা আমার চেনা । আজকাল কেউ আসল বাগদা চিংড়ির কাটলেট দেয় না । কিন্তু এরা দেয় । আমি তো চিংড়ির কাটলেট ছাড়া আর কিছুই খাবো না ঠিক করেছি !

—বাঃ, খুব ভালো কথা ।

—ক্যাটেরারদের চোখ টিপে দেবো । তোকেও বেশি করে দেবো !

হঠাৎ একটা হৈ হৈ শব্দ । চোখ তুলে দেখি, চন্দনদা ওপর তলা থেকে দ্রুত নামতে গিয়ে সেই রসগোল্লার রসে পা পিছলে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে ।

আমি দৌড়ে ধরতে গেলুম, ততক্ষণে চন্দনদা পৌঁছে গেছে একেবারে নিচের ধাপে । অনেক লোক দৌড়ে এলো । আমি চন্দনদাকে তুলে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ঠিক আছে, চন্দনদা ?

চন্দনদা খানিকক্ষণ মুখ বিকৃত করে রইলেন । চোখ বোঁজা । আন্তে আন্তে চোখ খুললেন । ঝাপসা থেকে ক্রমশ চোখের ফোকাস পরিষ্কার হলো ।

অকূল সমুদ্রে একটা দ্বীপ দেখার মতন চন্দনদা চমকে উঠে বললেন, নীলু ! পা-টা মচকে গেছে না ফ্ল্যাকচার হয়েছে বুঝতে পারছি না । দারুণ ব্যথা । সে কিছু না । কিন্তু হাসির বিয়েতে আমার পিড়ি ধরার কথা । এক্ষুনি শুভদৃষ্টি হবে । নীলু, তুমি একটু আমার হয়ে...

গঙ্গাসাগরের সেই সাপটাই নিশ্চয় ষড়যন্ত্র করে সিড়ির ওপর রসগোল্লার রস ফেলিয়েছে । নইলে আমাকেই হাসির বিয়ের পিড়ি ধরতে হবে কেন ?

একদিকে হাসির এক মাসতুতো ভাই, আর একদিকে আমি । হাসি আমাদের দু'জনের গলা জড়িয়ে ধরেছে, এই প্রথম হাসির স্পর্শ ।

আগেকার কালে যখন গৌরীদান হতো, তখন বাচ্চা মেয়েদের পিড়িতে তুলে বরের চারপাশে ঘোরানো হতো । এখন চব্বিশ পঁচিশ বছরের কমে মেয়েদের বিয়ে হয় না, তবু ঐ প্রথা চলে আসছে । আমার খালি মনে হচ্ছে, হাতটা পিছল লাগছে । হাত ফসকে পড়ে যাবে না তো হাসি !

সাত পাক ঘোরাবার পর শুভদৃষ্টি । একটা পাতলা চাদর দিয়ে হাসিকে আর রাজাকে আলাদাভাবে ঢেকে দিচ্ছে । সেই মুহূর্তে আমার দিকে তাকালো হাসি ।

কোনো কোনো সময় মুহূর্তই অনন্ত মুহূর্ত ।

হাসির চোখে চোখ ফেলে আমার বুক কাঁপলো না । আমার সেরকম ফালতু বুক নয় যে যখন তখন কাঁপবে । একটা পিড়ির ওপর বসা যুবতীকে তুলে ধরে

আছি, এর মধ্যে বুক কাঁপলেই হলো ! এখন আমার প্রধান চিন্তা পিড়িটা যেন হাত থেকে খসে না পড়ে যায় ।

রাহুলদা ওঁটা বিনা পয়সায় টিকিট দিয়েছিলেন । পাঁচমিশেলি জলসায় একটি নাম-না-জানা নর্তকীকে দেখে আমার বুক কেঁপেছিল । নাচ অনেক দেখেছি, গান অনেক শুনেছি, শুধু একজনই কাঁপিয়েছিল আমার বুক । সে আমাকে ঋণী করেছিল, আজ সেই ঋণ শোধ হলো ।

হাসির মুখের থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি রাজার দিকে তাকালুম । মনে মনে বললুম, তুমি এই মেয়েটির যোগ্য হও, রাজা । তোমার নিজেরই স্বার্থে ! এর পর ফের যদি কোনোদিন তোমাকে বেচাল হতে দেখি, তাহলে রণেন বা তাপসের সাহায্য লাগবে না । আমিই তোমাকে...ইয়ে...মানে...না না, ছি ছি, এখন এই শুভ মুহূর্তে এসব কথা ভাবতে নেই । যাঃ, আমি যে কী একটা হয়ে গেছি...রাজা, ভালো করে হাসির দিকে তাকাও, আগে তুমি হাসিকে অনেকবার দেখলেও এই মুহূর্ত থেকে তোমার দৃষ্টি শুভ হোক !
